জীবন যে রকম

আয়েশা ফয়েজ

উৎসর্গ

বাবা শেখ আবুল হোসেন
এবং ভাই শেখ নজরুল ইসলাম

তোমাদের বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে স্মরণ করি।

মুখবন্ধ

১৯৯১ সালে আমি যখন আমেরিকাতে আমার ছেলের কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম তখন নেহায়েতই খেয়ালের বশে এটা লিখেছিলাম। এটা কোনোদিন সত্যি সত্যি বই হিসেবে ছাপা হবে আমি ভাবিনি। আমার ছেলেমেয়েরা হঠাৎ করে এই পাণ্ডুলিপি খুঁজে বের করে এটা প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছে– সে জন্যে আমার লজ্জার সীমা নেই! ভালো-মন্দ যাই হোক তার জন্যে দায়ী আমার ছেলেমেয়েরা আমি নই।
১৯৯১ সাল পর্যন্ত যা যা ঘটেছিল তার সবই এখানে আছে– এর পরেও আমার পরিবারে আরো অনেক কিছু ঘটেছে, কিছু আনন্দের এবং কিছু বেদনার, তার কিছুই এখানে নেই। সেগুলো আবার নুতন করে লিখতে পারব মনে হয় না– তাই আর চেষ্টা করছি না।

আয়েশা ফয়েজ
জানুয়ারি, ২০০৮

ভূমিকা

আমেরিকায় ছেলের কাছে বেড়াতে এসেছি, অফুরন্ত অবসর। সময় কাটানোর জন্যে তাদের কম্পিউটারে দেশে নাতনিদের কাছে চিঠি লিখি। দেখে ছেলে এবং বউমা বলল, আপনার মতো বৈচিত্র্যময় ঘটনাবহুল জীবন আর কয়জন দেখেছে, সেটাই লিখে ফেলেন না কেন? আমাদের ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে পড়বে।

তাদের কথায় লিখতে শুরু করেছিলাম। 'জীবন যে রকম' আমার সেই চেষ্টার ফল।

ভূমিকায় একটা ছোট জিনিস বলে নেয়া দরকার। চেষ্টা করেছি জীবনের শুধু সেইসব ঘটনার কথা উলেখ করতে যেগুলো একালে দশজানের কাছে বৈচিত্র্যময় মনে হতে পারে, তবু স্থানে স্থানে একান্ত পারিবারিক কথা এসে গেছে। যখন আমার বড় ছেলে হুমায়ূন আহমেদের কথা এসেছে সেটা বেশির ভাগ সময়েই রেখে দিয়েছি দুটি কারণে। প্রথমত, বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হবার পর তার শৈশব, তার ব্যক্তিগত ইতিহাস শুনতে অনেকে আমার কাছে এসেছে, তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করার একটু চেষ্টা। দ্বিতীয়ত, শৈশবে যাদের ভালোবাসায় সে বড় হয়েছে কিন্তু তার স্মরণে নেই বলে যাদের কথা সে 'আমার ছেলেবেলা' বইয়ে লিখতে পারেনি, তাদের প্রতি তার হয়ে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার এটি একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা।

সবশেষে পাণ্ডুলিপি ছাপার উপযোগী করে দাঁড় করিয়ে দেয়ার জন্যে আমার ছেলে মুহম্মদ জাফর ইকবালকে অনেক ধন্যবাদ।

টিনটন ফলস
নিউ জার্সি

আয়েশা ফয়েজ
২১ অক্টোবর, ১৯৯১

এই দিন তো দিন নয় গো
আরো দিন তো আছে
এই দিনরে নিতাম চাই
সেই দিনেরো কাছে–

একটি গ্রাম্য গান

বেকার ছেলে

১৯৪৪ সনে ফেব্রুয়ারির আট তারিখে আমার একজন বেকার ছেলের সাথে বিয়ে হয়েছিল। ছেলেটি বিএ পাস করেছে, খুব এমএ পড়ার ইচ্ছে। আমার বাবা ছেলেটিকে দেখেই পছন্দ করে ফেললেন দুই কারণে–প্রথমত, সে অসাধারণ সুদর্শন, দ্বিতীয়ত, ছেলেটির মতো তার বাবাও শিক্ষিত। বিয়ের পর আমি আমার বাবার মোটামুটি সচ্ছল পরিবার থেকে এই পরিবারে উঠে এলাম।

আমি যে যুগের কথা বলছি সে যুগে বিয়ে হওয়ার পর বছর না ঘুরতেই বাচ্চা হবার কথা। কিন্তু চার বছর হয়ে গেল আমার কোনো বাচ্চা নেই। শ্বশুরবাড়িতে সে নিয়ে প্রথমে চাপা দুশ্চিন্তা এবং শেষের দিকে মোটামুটি বড় অশান্তি শুরু হয়ে গেল। বাসায় ভিক্ষে করতে এসে বুড়ি ভিখারিণীরা পর্যন্ত কপট কৌতূহলের সুরে আমার শ্বাশুড়িকে জিজ্ঞেস করে, কই গো চাচি, নাতি দেখান আপনার!

আমার শ্বাশুড়ি ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী, কিন্তু নেহায়েতই সাদাসিধে মায়াবতী মহিলা, লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন, আর নাতি। হলে কি আর তোমরা দেখতে না?

শ্বশুরবাড়িতে আমার প্রাণের বন্ধু হচ্ছে আমার ছোট ননদ হামিদা। সেও তার মায়ের রূপ পেয়েছে। পাড়া ঘুরে সে সারা গ্রামের কানাঘুষা আমার কাছে হাজির করত। একদিন এসে বলল, ভাবী, আপনার কেন বাচ্চা হয় না জানেন?

কেন?

কারণ আপনার নাম আয়েশা। আয়েশা নামের মেয়েদের বাচ্চা হয় না।

তোমাকে কে বলল?

সবাই তো তা-ই বলছে। দেখেন না আমার ফুফুর নাম আয়েশা, তারও বাচ্চা নেই।

এত বড় প্রমাণের পর আমি আর কী বলতে পারি?

আমার সাথে অন্য যে মানুষটির সমান অশান্তি যোগ করার কথা, আমার বেকার স্বামীর, তার কিন্তু এসব নিয়ে বিন্দুমাত্র অশান্তি ছিল না। উল্টো মাঝে মাঝে বলত, বাচ্চা কাচ্চার জন্য তোমাকে সবাই মিলে জ্বালাতন করছে না তো?

আমি চুপ করে থাকতাম, সে সান্ত্বনা দিয়ে বলত, গ্রামের মানুষ সাদাসিধে হয়, যখন যেটা মুখে আসে বলে ফেলে! তুমি মন খারাপ কোরো না। একটা চাকরী হোক তখন তোমাকে নিয়ে বাইরে চলে যাব।

কিন্তু সেই চাকরির কোনো দেখা নেই। কয়দিন খুব উৎসাহ নিয়ে একটা স্কুলে পড়াতে গেল, কিন্তু কিছুতেই বেতন আদায় করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত চাকরি ছেড়ে চলে এল। এর মাঝে একদিন আমার বাবা এলেন বেড়াতে। খোঁজ পেয়েছেন পুলিশে লোক নিচ্ছে, বেকার জামাইয়ের জন্যে তার কাগজপত্র নিয়ে এসেছেন। কাগজপত্র দেখে মানুষটি খুব মন খারাপ করে ফেলল, মাথা নেড়ে বলল, না, আমি পুলিশে চাকরি করব না।

বাবা বললেন, অন্তত ইন্টারভিউটা দাও। ইন্টারভিউ দিলেই তো আর চাকরি হয় না।

যে সময়ের কথা বলছি তখন বউদের দিনের বেলা স্বামীদের সাথে কথা বলার নিয়ম ছিল না, তাই সারা দিন অপেক্ষা করে রাতের বেলা আমাকে জিজ্ঞেস করল, আব্বা পুলিশের চাকরির জন্যে ইন্টারভিউ দিতে বলেছেন, কী করি বল তো?

আমি বললাম, এত আগ্রহ করে কাগজপত্র এনেছেন, ইন্টারভিউটা দিয়েই দাও। না হয় বাবার মন খারাপ হবে।

কিন্তু আমি পুলিশে চাকরি করব না।

কী করবে?

মাস্টারি করব।

মাস্টারি করে তো দেখেছই কী হচ্ছে, বেতনের কোনো দেখা নেই।

আমার পড়াশোনার মাঝে থাকার ইচ্ছা। এমএটা করব–

আব্বা স্বপ্নে দেখেছেন তোমার রিজিক পুলিশের মাঝে।

চোখ কপালে তুলে সে বলল, এর মাঝে এক রাউন্ড স্বপ্নও দেখা হয়ে গেছে! কোথায় যাই আমি এখন?

আমার কথা শুনে সে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইন্টারভিউ দিয়ে এল।

তারপর বেশ কয়দিন পার হয়ে গেছে, হঠাৎ একদিন সে ঘরের ভেতরে এসে হাজির। তখন দিনের বেলা ঘরের ভেতর বউদের সাথে কথা বলা অকল্পনীয় ব্যাপার! সেসবের তোয়াক্কা না করে আমাকে খুঁজে বের করে বলল, ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম মনে আছে? আজ রেজাল্ট হলো, আমি একটা চাকরি পেয়েছি।

আমি বউ মানুষ সবার সামনে স্বামীর সাথে কথা বলি কেমন করে? মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম, চোখের কোনা দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম, লোকটার কি মন খারাপ? কিছুতেই না পুলিশে যেতে চাইছিল না? আহা, খামাখা কেন জোর করে ইন্টারভিউ দিতে পাঠালাম।

সারা দিন আর কাটতে চায় না। একসময় রাত হলো, কিন্তু রাত হলেও যেতে পারি না যতক্ষণ শ্বাশুড়ি না যেতে বলছেন। শেষ পর্যন্ত শ্বাশুড়ি শুতে যেতে বললেন। আমি ছুটে ঘরে এসে মানুষটিকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি চাকরি পেয়ে আমার ওপর রাগ করেছ?

না না তোমার ওপর রাগ করব কেন?

তুমি যদি না চাও এ চাকরি কোরো না।

আমি করব। বেকার জীবন আর ভালো লাগে না। এখন বাইরে কোথাও তোমাকে নিয়ে চলে যাব।

কয়দিনের ভেতরেই সে ট্রেনিংয়ের জন্য সারদা চলে গেল। ট্রেনিং শেষে ফিরে এলে তার চাকরি হলো সিলেটে। আমি তার সাথে সিলেট এলাম। আমাদের নিজেদের জীবন শুরু হলো প্রথমবারের মতো।

নতুন মা

এর মাঝে দেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান হয়েছে। চব্বিশ বছর পর এই দেশটি ঠাণ্ডা মাথায় তিরিশ লাখ লোককে মেরে ফেলবে সে কথা তখন কেউ জানত না। কাজেই লোকজনের আনন্দের আর শেষ নেই। নতুন দেশে আমারও নতুন সংসার। বাবা আমার শ্বশুরকে নিয়ে আমাকে সিলেটে পৌঁছে দিয়ে চলে গেছেন। একা একা আর সময় কাটে না।

এর মাঝে হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে গেল। কিছু খেতে পারি না, জোর করে খেলে গা গুলিয়ে বমি হয়ে যায়। ডাক্তারের কাছে গেলাম, মেয়ে ডাক্তার এক নজর দেখেই বলল, মা, বাচ্চা হবে তোমার। এত অল্প বয়সে মা হতে যাচ্ছ খুব সাবধান থাকবে।

আমার শরীর শিহরিত হয়ে উঠল। নতুন একটা জীবনকে পৃথিবীতে আনছি আমি! কী আশ্চর্য!

ডাক্তার ভদ্রমহিলা আমাকে পরীক্ষা করে এক গাদা ভিটামিন ধরিয়ে দিলেন।

খবর শুনে হবু বাবার খুশি দেখে কে! বই কেনার একটা বাতিক ছিল, তখন তখনই গিয়ে মা এবং সন্তানের জন্মসংক্রান্ত আবুল হাসনাতের বই কিনে আনল। সে যুগে এ বিষয়ে তার বই ছিল বিখ্যাত। বিস্ময়, রোমাঞ্চ আর কৌতূহল নিয়ে দুজনে রাত জেগে জেগে পড়ি। যে শিশুটি পৃথিবীতে আসছে না জানি কী ভাগ্য নিয়ে আসছে।

আস্তে আস্তে খবর প্রচার হলো। প্রথমে এলেন আমাদের বিয়ের ঘটক, সম্পর্কে চাচা, দুদু মিয়া, যখন হাসেন তার শব্দে ঘর দরজা কাঁপে। আমার খবর শুনে পুরো পাড়া কাঁপিয়ে এবারে আরো জোরে হাসলেন। তারপর বললেন, এই খবর তো চিঠিপত্রে দেয়া যাবে না, সামনাসামনি দিতে হবে। চল বাড়ি যাই।

খেয়ালি মানুষ, সত্যি ছুটি নিয়ে আমাকে নিয়ে বাড়ি রওনা হলেন।

ভাইটামিন

প্রথমে শ্বশুরবাড়ি। খবর বার্তা নেই হঠাৎ করে হাজির হয়েছি, তাই সবাই খুব অবাক, তারপর মহাখুশি। আমার শ্বাশুড়ি সহজ-সরল মানুষ। সুখ-দুঃখ যে কোনো ব্যাপারেই তার মৃত বাবাকে মনে করে একবার কেঁদে ফেলতেন। এবারেও আঁচলে চোখ মুছে একটু কেঁদে নিলেন। কুশল বিনিময় হলো, হাতমুখ ধুয়ে দুদু চাচা জল চৌকিতে পা তুলে বসে রহস্যের মুখ করে আমার শ্বশুরকে বললেন, বেয়াই সাহেব, খবর আছে।

কী খবর?

আপনার তো নাতি আসছে।

আমার শ্বশুর অত্যন্ত ধর্মভীরু মানুষ, সাথে সাথে হাত তুলে খোদার কাছে শুকুর করলেন। আমার শ্বাশুড়ি আমাকে বুকে জড়িয়ে আবার ভেউ ভেউ করে কান্না, আহা রে আজ যদি আমার বাজান বেঁচে থাকতেন–

সাথে সাথে লোক পাঠানো হলো আমার নানি শ্বাশুড়িকে আনার জন্য। গত চার বছর এমন কোনো তাবিজ কবজ নেই যেটা আমার উপরে তিনি পরীক্ষা করে দেখেননি! দেখতে দেখতে পুরো এলাকার পাড়া পড়শী, বউ ঝি এসে হাজির। লোকে লোকারণ্য, ঘরে পা ফেলার জায়গা নেই! সহজ-সরল গ্রামের মানুষগুলোর কথা শুনে মনে হলো আমি সাধারণ কোনো শিশু নয়, অলৌকিক ক্ষমতাবান এক দেবশিশুকে পৃথিবীতে আনছি।

রাতে খাবার পর যেই ভাইটামিন মুখে দিয়েছি। আমার নানি শ্বাশুড়ি হা হা করে উঠলেন, কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ! করছ কী? পোয়াতি মানুষ ওষুধ খাচ্ছ?

ওষুধ না, ভাইটামিন। আবুল হাসনাতের বই থেকে উদ্ধৃতি দেবার আগেই নানি শ্বাশুড়ি ছুটে বের হয়ে গিয়ে আমার স্বামী বেচারাকে ধরলেন, হুংকার দিয়ে

বললেন, ফয়জুর রহমান-

কোনো এক অজ্ঞাত কারণে শ্বশুরবাড়িতে তাকে সবাই সব সময়ে পুরো নাম ধরে ডাকত।

সে বলল, জি নানিজান–

পোয়াতি বউকে তুমি ওষুধ এনে দিয়েছ?

আমি দেই নাই, ডাক্তার দিয়েছে। আর ওটা ওষুধ না, ভাইটামিন।

একই কথা। পেটে বাচ্চা ওষুধ খাবে মানে?

নানিজান, যারা ভাইটামিন দিয়েছে তারা অনেক পড়াশোনা করে ডাক্তার হয়েছে। আপনার থেকে তারা এসব জিনিস ভালো বোঝে।

শুনে আমার নানি শ্বাশুড়ি রেগে মেগে আগুন হয়ে গেলেন। আমি দেখলাম মহা বিপদ, তাকে কোনোমতে শান্ত করে বললাম, নানিজান, আমি আসলে এগুলো একেবারে খাই টাই না। জানতে পেলে রেগে যায় তাই শুধু মাঝেমধ্যে মুখে দিই।

ঠিক তো?

জি।

শুনে একটু শান্ত হলেন। শ্বশুরকে গিয়ে বললেন, ফয়জুর রহমানের আর বুদ্ধি সুদ্ধি হলো না, কিন্তু বউটার মনে হয় একটু বুদ্ধি আছে!

ভূতের ঝাড়ু

রাতে শুতে যাব, আমার শ্বাশুড়ি বললেন, দাঁড়াও বৌমা, তোমাকে একটা ঝাড়া দিয়ে দিই।

তিনি একটা ঝাড়ু আনলেন, তার সাথে একটুকরো মাছ ধরার জাল, এক টুকরা জং ধরা লোহা, আরো কী সব গাছের লতাপাতা। সব কিছু এক সাথে বেঁধে নিয়ে সেটা আমার শরীরে বুলিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বললেন, খুব সাবধান, পোয়াতি মানুষের ওপর কিন্তু উপরি বাতাস থাকে।

তারপর আমার শাড়ির আঁচলে একটু থুতু দিয়ে আঁচলটা গুঁজে দিয়ে আমাকে ধরে ধরে শোওয়ার ঘরে পৌঁছে দিলেন। যাবার সময় বললেন, খবরদার, সকালে একা বাইরে যাবে না! আমি নিয়ে যাব।

শুরু হলো আমার উপর চোখ রাখা। এক মুহূর্ত সময়ের জন্যে কেউ চোখের আড়াল করে না– বাথরুমে গেলেও শ্বাশুড়ি বাইরে থেকে বাথরুমের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। সর্বক্ষণ হাতের কাছে সেই ভূতের ঝাড়ু, একটু পর পর সেটা দিয়ে ঝেড়ে কুদৃষ্টি কাটিয়ে দিচ্ছেন। আমার নিজের সময় পাই যখন শ্বাশুড়ি নামাজ পড়তে যান তখন। নামাজের ঘরে আলাদা একটা ছোট দরজা ছিল, নামাজের অজু করে এই দরজা দিয়ে ঢুকতেন, একেবারে নামাজ শেষ করে বের হতেন! তার মাঝেও কীভাবে ধরে ফেলতেন আমি আশেপাশে নেই, আর ঠিক আমার পাশে এসে হাজির হতেন!

আমি সন্তানসম্ভবা খবর পেয়ে দূর দূর থেকে বউ-ঝিরা দেখতে আসা শুরু করেছে। আমার শ্বাশুড়ি শ্যেন দৃষ্টিতে আমাকে আগলে রাখেন, কখন কার দৃষ্টি লেগে যায়। গ্রামে দুর্লক্ষণযুক্তা হিসেবে পরিচিত কেউ এলেই তিনি আঁচলে একটু থুতু দিয়ে গুঁজে দিতেন, এতে নাকি দৃষ্টি লাগতে পারে না।

আমার ফুফু শ্বাশুড়ি যার নামও আয়েশা তিনিও সময় পেলেই আমাকে

দেখতে আসেন। আয়েশা নামের বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়েছি সেই আনন্দেই কি না জানি না, এলেই আমাকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকেন। একটু পরে পরে জিজ্ঞেস করেন, মা তোমার শরীর ভালো তো?

উত্তর দেন শ্বাশুড়ি, আর বলবেন না বুবু, দেখেন না, বউমা শুকিয়ে একেবারে কাঠি হয়ে গেছে! কিছু খেতে পারে না, কী হবে এখন–

সবাই মিলে তখন গবেষণা হয়, রান্না হয়, গায়ে হাত বুলিয়ে মুখে খাবার তুলে দেয়া হয়।

এতকাল পর সেইসব মনে পড়ে চোখে ছাই পানি এসে যায়।

বাবার বাড়ি

আমার বাবার বাড়ি মোহনগঞ্জ যাবার আগে রাতে আমার শ্বশুর আমাকে কাছে ডেকে এনে বসালেন। তারপর বললেন, আমি যে তোমাকে আম্মা ডাকি তুমি বিরক্ত হও না তো?

আমি বললাম, কী বলেন আপনি আব্বা!

আমার মা অনেক দিন বেঁচে ছিলেন। আমি গরিব মানুষ, জীবিকা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, আজ এক জায়গায় কাল আরেক জায়গায়, কখনো মন ভরে তাকে ডাকার সুযোগ পাই নাই। এই জন্যে তোমাকে আম্মা বলে ডাকি। আম্মা, আমি কাঙ্গাল মানুষ, আল্লাহ্‌র কাছে ধন চাই নাই, শুধু জন চেয়েছি। আল্লাহর কাছে দুই জিনিস চাওয়া যায় না।

আমার শ্বশুর মৃত্যুর সপ্তাহখানেক আগে সবাইকে ডেকে বলেছিলেন, তিনি অমুক দিন এতটার সময় মারা যাবেন। সত্যি সত্যি তিনি ঠিক সেই সময় মারা গিয়েছিলেন। ঋষিতুল্য এই মানুষটির অনেক ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল। আমার জন্যে খোদার কাছে হাত তুলে যে দোয়া করেছিলেন সেটিও সত্যি হয়েছে। আমার জীবনে ঐশ্বর্য বলতে যা বোঝায় সেটি সত্যি কখনো হয়নি, কিন্তু আমার কোলজুড়ে এসেছে ছয়টি সন্তান। শুধু যে নিজের সন্তানরা আমার আপনজন তাই নয়, আমি আমার ঘটনাবহুল জীবনে অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে এসেছি, অসংখ্য মানুষ অকাতরে আমাকে মা বলে ডেকেছে, আমাকে হাজার দুঃখ-কষ্ট-বিপদের মাঝে আমাকে নিজের মায়ের মতো বুকে আগলে রেখেছে।

বাবার বাড়িতে পৌছানোর পর আবার সেই আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

আনন্দের যেন বাণ ডেকে গেল। আমার বাবা-চাচারা তিন ভাই তিনবার গিয়ে মিষ্টি কিনে আনলেন। আমার নানি এলেন সুদূর কৈলাটি থেকে, আমার মামারা এলেন। তারপর আবার শুরু হলো সেই চোখে চোখে রাখা–দুপুরে বের হবে না, চুল খোলা রাখবে না ইত্যাদি হাজার রকম নিয়মকানুন। যখন আবার সিলেট ফিরে যাবার কথা সবাই একেবারে হা হা করে উঠল, এ রকম অবস্থায় সিলেট যাবে কেমন করে? অনেক বুঝিয়ে আমি আবার সিলেট ফিরে গেলাম।

ঠিক সাত মাসের সময় আমাকে আবার বাবা বাড়ি নিয়ে এলেন। এতদিনে শরীর একটু ঠিক হয়েছে, ভালো মন্দ খেতে পারি। গ্রামের নিয়ম সন্তানসম্ভবা মেয়েদের যত্ন করে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে হয়। তাই আমার তখন কাজই হলো বাড়ি বাড়ি গিয়ে দাওয়াত খাওয়া, আর সে কি তার আয়োজন, এ যুগে তার কল্পনা করা যায় না! শুধু যে দাওয়াত খাওয়া তাই, নয় নানা জায়গা থেকে নানা রকম খাবার আসতে শুরু করল। যার গাছে ভালো ফল, সে পাঠাল ফল, যার আচার বানানোর হাত সে পাঠাল আচার, যার পুকুরে বড় মাছ সে পাঠাল মাছ ভাজা, যার বাগানে ভালো সবজি সে পাঠাল সবজি, সে এক এলাহী ব্যাপার। আমি সবার মধ্যমণি হয়ে বসে শুধু দিন গুনি!

আজমীর শরীফের ফুল

যেদিন আজমীর শরীফ থেকে আনা ফুলটি পানিতে ভিজিয়ে দেয়া হলো আমি বুঝলাম আর দেরি নেই। এই ফুলের অলৌকিক ক্ষমতা, পানিতে ভিজিয়ে রাখলে ফুটে উঠে আর সেটা ফোটা মাত্র বাচ্চার জন্ম হয়ে যাবে। সেদিন নভেম্বরের বারো তারিখ আমার অল্প অল্প ব্যথা। হাতে-পায়ে তাবিজ বেঁধে দেয়া হয়েছে, গুড় পড়া, পানি পড়া খাচ্ছি। একটু পরে পরে খোঁজ নিই ফুলের কী অবস্থা। বারো ঘণ্টা পর ফুল ফুটে গেল কিন্তু বাচ্চার জন্মের কোনো নিশানাই নেই। এত মূল্যবান ফুল তো কোনো ভুল করতে পারে না, ভুল নিশ্চয় আমারই। আমি লজ্জায় মরে যাই!

চারদিকে খবর চলে গেছে সে রাতেই আশেপাশে যারা ছিল সবাই চলে এল। বাড়িভর্তি লোকজন হৈ চৈ সব মিলিয়ে একটা উৎসবের মতো পরিবেশ। পান সাজানো হচ্ছে, সুপারি কাটা হচ্ছে, কাঁথা সেলাই হচ্ছে, মালসায় আগুন তৈরি করা হচ্ছে। কোনোমতে রাত ভোর হলো কিন্তু বাচ্চার কোনো দেখা নেই। দুজন গ্রাম্য দাই বসে বসে লম্বা লম্বা হাই তুলতে থাকে।

পরদিন আস্তে আস্তে ব্যথা বাড়তে থাকে। সারা দিন আমি যন্ত্রণায় ছটফট করছি, আস্তে আস্তে মনে হতে থাকল যে কষ্টে আমি মরেই যাব। যে শিশুটির জন্যে এই কষ্ট একসময় মনে হলো তার আর মুখও আমি দেখতে চাই না। অবস্থা দেখে সরকারি ডাক্তারকে আনা হয়েছে, তিনি চিন্তিত মুখে বসে আছেন। একটু পর পর বলছেন, আর খানিকক্ষণ দেখি তারপর না হয় ফোরসেপ ডেলিভারির চেষ্টা করব।

যে বাড়ি একটু আগে আনন্দে ঝলমল করছিল সেই বাড়ি এখন থমথম করছে। কারো নাওয়া-খাওয়া নেই।

রাত নয়টার দিকে অমানুষিক যন্ত্রণায় মাঝে আমার সন্তানের জন্ম হলো,

আমার আর তারপর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হলো ঘরভরা মানুষ, হৈ চৈ চেঁচামেচিতে কান পাতা যায় না। আমার ভাই বোনেরা ধাক্কাধাক্কি করে বাচ্চা দেখছে, আনন্দ উল্লাসে ঘর ভরপুর। ছেলে হয়েছে শুনতে পেলাম কিন্তু এক নজর বাচ্চাকে দেখতে পারলাম না, নিজ থেকে দেখতে চাইব এত বড় নির্লজ্জ কাজ করি কেমন করে?

আমার জন্যে নিচে বিছানা করা হলো। প্রথমে খড় বিছিয়ে তার ওপর তোষক। কাছে একটা মালসায় পাটের পাতা, হলুদের গুঁড়া, সরিষার আর ধূপ পোড়ানো হচ্ছে, যেই ভেতরে আসবে এই আগুনে গা-হাত-পা সেঁকে আসতে হবে। ভূত প্রেত যা আছে কারো সাধ্যি নেই এই কঠিন প্রহরা ভেদ করে ভেতরে আসে! আমাকে নিজের বিছানায় শুইয়ে বাচ্চাকে এনে দেয়া হলো, মাথাভরা কাল চুল, টকটকে ফর্সা গায়ের রং, চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, ভাবখানা, কি? বলছিলে না আমার মুখ দেখবে না? এখন?

আমার বুকের ভেতর নড়েচড়ে গেল আমার প্রথম ছেলের মুখ দেখে!

তখনো আমি জানতাম না আমার এই ছেলে এককালে হুমায়ূন আহমেদ নামে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক হিসেবে সুপরিচিত হবে।

কাজল

বাচ্চার নাম রাখা হলো কাজল। কাজলের জন্মের খবর জানিয়ে তার বাবাকে টেলিগ্রাম করা হলো পরদিন ভোরে। তার তখন খুব কাজের চাপ, আসতে পারল না। অন্যেরা এল।

আমার নানি এসে কাজলকে মানুষ করার কাজে লেগে গেলেন। প্রথমে নানা রকম গাছগাছালির পাতা ছেঁচে রস, মধু আর এক টুকরা লোহা তার সাথে গরম করে সেই তরলটুকু খাইয়ে দিলেন। তারপর খানিকটা শর্ষের তেল, নিজে ঘাণি থেকে ভেঙে এনেছেন। বিদঘুটে সেই জিনিস খেয়ে কাজলের সে কি চিৎকার! আমি বাচ্চা মানুষ করা নিয়ে কত বই পড়ে দেখেছি কোথাও তো এসব দেখিনি! কাজলের চিৎকার দেখে বুকটা ভেঙে যাবার অবস্থা, এক সময় না পেরে বলেই ফেললাম, নানিজান এসব খাওয়ানো ঠিক না।

নানি চোখ কপালে তুলে বললেন, কেন?

বাচ্চা কষ্ট পায়।

শুনে নানির সে কি হাসি, চিৎকার করে বললেন, তোমরা শুনে যাও আমার নাতনি কী বলে। আমি নাতির ঘরে পুতি দেখছি আর আমি নাকি বাচ্চা মানুষ করতে জানি না!

শুনে সবার সে কি হাসাহাসি। আমি আর কী করি, মুখ ভার করে সরে গেলাম। শুধু যে কাজলের ওপর অত্যাচার তাই না, আমার উপরেও অত্যাচার। ঠাণ্ডা পানি খেতে পারব না, গরম পানি খেতে হবে। তাও একদিন দুদিন নয়, পুরো চল্লিশ দিন। সাথে আতপ চালের নরম ভাত, ঘি আর আলু সেদ্ধ আদা দিয়ে মেখে। রাতের খাওয়া সেরে নিতে হতো সন্ধ্যার আগে, কবুতর না হয় মুরগির বাচ্চা আলাদা করে রান্না করা হতো আমার জন্যে। রাতে শুধু দুধ। তার ওপর ছিল সেঁকা। আমার জন্যে সেঁক কাজলের জন্যে সেঁক। কাজলের নাভি

পড়ার আগে এক রকম সেঁক, নাভি পড়ার পর আবার অন্য রকম সেঁক।

কাজলের বয়স যখন নয়দিন তখন নাপিত এল তার মাথা কামানোর জন্য। মায়ের পেট থেকে যে চুল নিয়ে আসে সেটি নাকি নাপাক, মাথায় রাখা ঠিক না। নাপিত এলে তাকে পান খেতে দেয়া হলো। নাপিত নতুন ধূতি পরে পান খেয়ে মুখ লাল করে চুল কামাতে বসে। তার সাথে সবার রসিকতার সম্পর্ক, ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে ক্ষুর চালিয়ে কাজলের মাথা ন্যাড়া করার সময় তার কোচ খুলে তাতে রাজ্যের জিনিস বেঁধে দেয়া হয়েছে। সে আর উঠে দাঁড়াতে পারে না, তাই দেখে সবাই হেসে গড়াগড়ি! কাজ শেষ হলে নাপিতকে ডালা ভরা চাল, পান সুপারি আর একটা রুপার টাকা দিয়ে বিদেয় করা হলো। তখন আমি কাজলকে নিয়ে ঘর থেকে বের হবার অনুমতি পেলাম। সবাই মিলে আমাকে সাজিয়েছে, কাজলকে সাজিয়েছে আরো বেশি, আমি যাচ্ছি আর আমার সামনে ধানের খই ছিটিয়ে দিচ্ছে সবাই।

রাতে আরো বড় হৈ চৈ। ঘটা করে খাওয়া-দাওয়া করে সকাল সকাল শুয়ে পড়তে হলো। ঘরে দোয়া কালাম লিখে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আজ রাত বারটায় ফেরেশতারা কাজলের ভাগ্য লিখতে আসবে। ভুল করে আবার যদি ভূত প্রেত এসে পড়ে তখন? আমার শাশুড়ির দেখাদেখি এখানেও তৈরি হয়েছে ভূতের ঝাড়ু, সেটাও ঝুলছে এক কোনায়। ভূত প্রেতের সাধ্যি কি ভেতরে ঢুকে!

রাত বারোটায় আমি জেগে আছি। কপালে ভাগ্য লিখছে ফেরেশতারা। আহা, ভালো কিছু যেন লিখে দেয় আমার সোনার কপালে।

শামসুর রহমান

কাজলের বাবা বাচ্চা দেখতে আসার সুযোগ পেল এক মাস পর। তার খুব মেয়ের শখ ছিল। আমার ছোটভাই নজরুল তখন সিলেটে থেকে পড়াশোনা করত। তাকে বলে রেখেছিল দেশ থেকে টেলিগ্রাম এলে অফিসে নিয়ে যেতে। যদি ছেলে হয় সে পাবে দশ টাকা সাথে রংমহলে একটা সিনেমা। যদি মেয়ে হয় তাহলে পাবে বিশ টাকা আর রংমহলে দুইটা সিনেমা!

কাজলের বাবা মোহনগঞ্জে পৌঁছাল রাতের ট্রেনে। সবাই স্টেশনে হাজির। বাড়ির বৌ ঝিরাও সবাই জেগে নতুন বাবা তার বাচ্চাকে দেখে কি করে দেখবে। সবার ধারণা ছিল হয়তো একটু লজ্জা পাবে, মুখ ফুটে বেশি কিছু বলবে না। কিন্তু কিসের লজ্জা। বাড়ি পৌঁছেই আমার মাকে বলল, আম্মা, কোথায় বাচ্চা দেখান তাড়াতাড়ি।

আমার নানি সাবধানে কাজলকে তার হাতে তুলে দিলেন, অবাক হয়ে খানিকক্ষণ দেখে তাকে বুকে চেপে ধরে তার সে কি আদর!

দেখে আমার নানির সে কি খুশি!

নানি তার পরদিন পর বাড়ি চলে গেলেন। দুদিন পর খবর পেলাম কলেরা হয়ে আমার ছোট মামা আর নানি মারা গেছেন।

সে রাতে অবশ্যি বাড়িতে আনন্দ আর হৈ চৈ। জামাইকে ঘিরে সবাই বসে আছে, গল্প গুজব হচ্ছে। ঘুমাতে ঘুমাতে প্রায় রাত শেষ হবার অবস্থা। আমার সাথে যখন প্রথম নিরিবিলি দেখা হলো প্রথমেই বলল, কাজলের ভাগ্য গণনা করে ফেলেছি!

কী ভাবে করলে?

বইপত্র কিনে পড়াশোনা করেছিলাম।

কী আছে ভাগ্যে?

অনেক বিখ্যাত হবে তোমার ছেলে! জান রানী এলিজাবেথের ছেলে আর তোমার ছেলের জন্ম একই দিনে, একই লগ্নে?

আমি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসলাম, কোথায় রানী এলিজাবেথ আর কোথায় আমি!

কাজলের বাবা গম্ভীর হয়ে বলল, রানীর ছেলে বিখ্যাত হবে বাবা-মায়ের নামে, আর আমার ছেলে বিখ্যাত হবে তার নিজের যোগ্যতায়! তুমি দেখে নিও।

তখন তার কথা বেশি গুরুত্ব দিয়ে নিইনি। সব বাবা মাই তো ভাবে তার ছেলে অনেক বড় হবে, সেটা আর বিচিত্র কি? কিন্তু তার বলার ধরনটি ছিল অন্য রকম, কেমন জানি বিশ্বাস নিয়ে বলত। আজ সত্যিই তার ছেলে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় কথাশিল্পী হয়ে পরিচিত, দুঃখ সেই মানুষ সেটি দেখে যেতে পারল না।

কাজলের বাবার ছুটি ছিল অল্প কয়দিনের, সে চলে গেল দুদিন পরেই। আমি সিলেট ফিরে গেলাম যখন কাজলের বয়স আড়াই মাস তখন। যাবার সময় কয়দিন শ্বশুরবাড়ি থেকে গেলাম, সেখানে আবার সেই একই রকম আনন্দ উৎসব! আমার এক চাচা শ্বশুর কাজলকে দেখে বললেন, বলেছিলাম না ছেলে হবে? এই বংশে বার সিঁড়ি প্রথম সন্তান ছেলে।

শাশুড়ি বললেন, বউমা, তুমি ছেলের মুখের দিকে বেশি তাকাবে না। নজর লেগে যাবে তা হলে। বাবা-মায়ের নজর কিন্তু সবচেয়ে বেশি লাগে! ফয়জুর রহমানকেও না করবে। সে তো কোনো কথা শোনে না, দুই পাতা বই পড়ে মনে করে দুনিয়ার সব কিছু জেনে গেছে।

আমার বাবা আর শ্বশুর আমাকে সিলেট পৌছে দিলেন। দুজনের খুব খাতির ছিল। কোনো সুযোগ পেলেই একসাথে বের হয়ে পড়তেন! বাড়ি ফিরে যাবার আগে দুজনে অনেক চিন্তাভাবনা করে কাজলের ভালো নাম রাখলেন শামসুর রহমান।

তারা চলে যাবার পর পরই কাজলের বাবা কী ভেবে তার নাম পাল্টে রেখে ফেলল হুমায়ূন আহমেদ। ভাগ্যিস রেখেছিল তা না হলে সমকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় কথাশিল্পীকে আলাদা করতে হতো একটি মাত্র আকার দিয়ে! একজন হতেন কবি শামসুর রাহমান, আরেকজন হতো কথাশিল্পী শামসুর রহমান!

আমার শাশুড়ি অবশ্যি কখনোই হুমায়ূন নামটাকে গ্রহণ করেননি। শেষদিন পর্যন্ত আমাকে ডেকে গেছেন শামসুর মা!

টাইফয়েড

এর কিছুদিন পর আমার টাইফয়েড হলো। প্রথমে অল্প অল্প জ্বর। ধীরে ধীরে সেই জ্বর বাড়তে থাকে। কয়দিন পর আমার আর কিছু মনে নেই। কাজল তখন ছোট, তাকে বুকে করে আগলে রাখল তার চাচা আজীজ। বাড়িতে খবর গেল। সাথে সাথে আমার বাবা-মা ছুটে এলেন আমার এক দূর সম্পর্কের বোনকে নিয়ে। এখন অবিশ্বাস্য হতে পারে কিন্তু তখন টাইফয়েডের কোনো চিকিৎসা ছিল না। বাবা পাগলের মতো শাহজালালের মাজারে গিয়ে খোদার কাছে কান্নাকাটি করতে থাকলেন। একদিন দুদিন করে বাহান্ন দিন হয়ে গেল কিন্তু তবু জ্বর কমল না। তাকে উদভ্রান্তের মতো ঘুরতে দেখে একজন পাগল গোছের মানুষ তাকে একটু তার্পিন তেল দিয়ে বলল, যা তোর মেয়েকে গিয়ে খাইয়ে দে।

তার্পিন তেল খাওয়াব?

হ্যাঁ।

ডুবন্ত মানুষ যে রকম খড়কুটো আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করে বাবার তখন সে রকম অবস্থা। সেই তার্পিন তেলই আমাকে খাইয়ে দিলেন। আমার জ্বর তারপর নাকি সত্যিই কমে গেল। অলৌকিক জিনিস আমি ঠিক বিশ্বাস করি না, যার জীবনী শক্তি থাকে সে বেঁচে থাকে যার থাকে, না সে শেষ হয়ে যায়। আমার ছিল তাই হয়তো বেঁচে গেছি। তবে টাইফয়েড ছিল কালান্তক ব্যাধি, যে বেঁচে যায় তাকেও একটা বড় মাশুল দিতে হয়। আমিও দিলাম, পুরোপুরি পাগল হয়ে গেলাম।

আমার সেসব কিছু মনে নেই, লোকজনের মুখে শুনেছি, আমি কাউকে চিনতাম না। কেউ কাছে এলে বলতাম, কী কিছু লাগবে? টাকা পয়সা?

তারপর বালিশের নিচে হাত দিয়ে বের করে আনতাম মুঠি মুঠি কাল্পনিক

টাকা! ছড়িয়ে দিয়ে বলতাম, নাও যত খুশি নাও।

দীর্ঘদিন আমি উন্মাদিনী হয়ে রইলাম। সুস্থ হব সে রকম আশা সবাই ছেড়েই দিয়েছিল, তখন সবাইকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ একদিন আমি প্রকৃতস্থ হয়ে উঠলাম, ধীরে ধীরে সব স্মৃতি ফিরে এল। কি বিস্ময়কর ব্যাপার, আমি দেখি একটা ছোট বাচ্চা হেঁটে বেড়াচ্ছে, কথা বলছে, সে নাকি কাজল! আমার কাছে আসতে চায় না, দূর থেকে কৌতূহলী চোখে দেখে, বাবা বলে হাত বাড়াতেই দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমার নিজেকে দেখার ইচ্ছে করল, একজনকে বললাম একটা আয়না এনে দিতে। কিন্তু কেউই আয়না আনতে চায় না, ব্যাপারটা কি? অনেক বলে কয়ে যখন আয়না আনা হলো আমি দেখে চমকে উঠলাম! এই কি আমি! মাথায় চুল নেই, বিবর্ণ শুষ্ক চামড়া, হতচ্ছাড়া চেহারা, মুখ খুলতেই শিউরে উঠে দেখলাম কুচকুচে কাল দাঁত! মানুষের চেহারা কখনো এ রকম হয়? দাঁত কাল হয় কেমন করে?

দুরন্ত ছেলে

অবস্থা একটু স্বাভাবিক হওয়ার পর আবিষ্কার করলাম কাজলকে নিয়ে একটু সমস্যা হয়েছে। আমি দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার সময় আমার মা তাকে বড় করেছেন, নানি-দাদিরা সাধারণত নাতি নাতনিকে বাড়াবাড়ি আদর করে থাকেন। কাজলকে শুধু আদর করা হয়নি, সব ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীনতাও দেয়া হয়েছে। তার ফলে সে আমার কাছে ফিরে এসেছে ভয়ানক রকম স্বাধীন জেদি একজন বাচ্চা হিসেবে। শুধু জেদি বাচ্চা হলে তাকে সামলানো যায় কিন্তু তার জেদ ছিল বিচিত্র। যেমন একদিন হঠাৎ তারস্বরে চিৎকার করতে শুরু করল যে গাছের সব কাঁঠাল এক্ষুণি পেড়ে ফেলতে হবে। গাছে কাঁঠাল তখনো বড় হয়নি, খুবই ছোট, মাত্র এঁচোড় হয়ে বের হয়েছে।

সে কাঁঠাল থেকে লিচু বেশি পছন্দ করে—গাছভরা লিচু বড় হয়ে কাঁঠাল হবার আগেই সে সেগুলোকে পেড়ে ফেলতে চাইছে! আমি মহা বিরক্ত, তার আব্বা কিন্তু খুব খুশি, মাথা নেড়ে বললেন, দেখেছ এই বয়সে কি রকম সূক্ষ্ম লজিক? বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু একবার এ রকম করেছিলেন, স্কুলে একবার জিজ্ঞেস করা হলো চিরুনীর অন্য নাম কী? জগদীশ চন্দ্র বসু বললেন ফারুনী! চিন্তা করার ক্ষমতা হচ্ছে বড় জিনিস!

আরেক দিন বাসায় ভিক্ষুক এসেছে। ভাত খেতে দেয়া হলো। কুয়ার পাড়ে বসে ডাল দিয়ে ভাত খেয়ে উঠে যাবার পর কাজল ঘোষণা করল তাকে একই জায়গায় একই প্লেটে সমান পরিমাণ ডাল দিয়ে ভাত দিতে হবে। কিছুতেই বোঝানো গেল না, শেষ পর্যন্ত তাকে ভিক্ষুকের মতো ভাত দিতে হলো। হাঁটুমুড়ি দিয়ে প্রবল উৎসাহে সে খাওয়া শুরু করল, কিন্তু দুই গ্রাস খেয়েই তার উৎসাহ শেষ।

রাতে তার বাবা শুনে বলল, দেখ কি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। ক্ষুধার্ত

ভিক্ষুক নিশ্চয়ই খুব তৃপ্তি করে খেয়েছে, তার খাওয়া দেখে সেও ভেবেছে ভিক্ষুকের মতো এখানে বসে খেলে সেও নিশ্চয়ই অনেক তৃপ্তি করে খাবে!

তখন দেশে দুর্ভিক্ষ, জায়গায় জায়গায় লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে। দুবেলা কলাপাতা বিছিয়ে বুভুক্ষু মানুষ খিচুড়ি খায় সেখানে। হঠাৎ দেখা গেল কাজল তার ছোট বোন শেফুকে নিয়ে সেখানে মহানন্দে খিচুড়ি খেয়ে যাচ্ছে। কানে ধরে বাসায় পৌঁছে দেয়া হলো! লজ্জায় মরে যাই আমি। রাতে তার বাবাকে বললাম, এখন বল এটার কি অর্থ?

মাথা চুলকে বলল, কী অর্থ জানি না কিন্তু দেখছ না সে দশজন থেকে আলাদা? প্রমথনাথ বিশী একবার কী করেছিলেন শোন–

আমি হাল ছেড়ে দিলাম।

শেফু

কাজলের জন্মের দুবছর পর বড় মেয়ের জন্ম হলো। বাবার বাড়িতে ছিলাম, যেদিন তার জন্ম হলো সবাই মাছ ধরতে গিয়েছে। এত মাছ ধরা পড়েছে যে কেউ আর টেনে বাড়ি আনতে পারে না। এরপর দীর্ঘদিন মাছ ধরতে গেলে সবাই এই মৎসকুমারীকে ছুঁয়ে যেত!

ওর আব্বার খুব মেয়ের শখ, কাজেই তার আর আনন্দের সীমা নেই। মাসখানেক পর মেয়েকে নিয়ে সিলেটে গিয়ে দেখি ইতিমধ্যে তার জন্যে একটা হারমোনিয়াম কিনে রেখেছে। এক মাসের বাচ্চা হারমোনিয়াম দিয়ে কী করবে সেটা আর খামাখা জিজ্ঞেস করলাম না!

মেয়ের নাম রাখা হলো শেফালী, ক্রমে সেটা সংক্ষিপ্ত হয়ে রূপ নিল শেফু। শেফু আর কাজল ছেলেবেলায় ছিল হরিহর আত্মা। কাজলের দুষ্টু বুদ্ধি আর সহকারী হিসেবে শেফু এই দুই মিলিয়ে আমার প্রাণ অতিষ্ঠ হবার অবস্থা। ছেলেবেলায় তার ওপর সে ছিল যেরকম একরোখা তেমনি রাগী, বড় হয়ে শান্ত হয়েছে।

চাটগাঁতে থাকার সময় সে আর তার ছোটভাই ইকবাল প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে পড়ত। সে যুগে প্রয়োজনে স্কুলে মারধর করা হতো, তাদের স্কুলে একজন শিক্ষক ছিল যিনি মারধরে বিশেষ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। শিক্ষক হিসেবেও যে ভালো ছিলেন তা বলা যায় না। কারণ একদিন তিনি ক্লাসে ঘৃণা শব্দটি দিয়ে বাক্য রচনা করতে বললেন। একজন অনেক ভেবে চিন্তে বলল, মেথরকে ঘৃণা করিতে হয় না।

শুনে শিক্ষক ভদ্রলোক একেবারে খেকিয়ে উঠলেন, কী বললি? মেথরকে ঘৃণা করিতে হয় না? যা মেথরের গলা ধরে ঝুলে থাক গিয়ে! হারামজাদা বেকুব কোথাকার!

ভাগ্যিস ছোট বাচ্চারা বড়দের থেকে ভালো বুঝে, তাই এ রকম একজন-দুজন শিক্ষক বাচ্চাদের সহজাত প্রকৃত মূল্যবোধকে এত সহজে উল্টোদিকে নিতে পারে না।

এই শিক্ষকের আরো একটি খারাপ অভ্যাস ছিল, তিনি মাঝেমধ্যে স্কুলের বাচ্চাদের কাছে টাকা ধার চাইতেন। ক্লাস থ্রির বাচ্চা টাকা পাবে কোথায়? কাজেই তারা বাসায় এসে বাবা-মাকে বলত এবং তিনি বাসায় গিয়ে বলার জন্য বাচ্চাদের ছুটি দিয়ে দিতেন। শেফুও এসে একদিন স্যারের জন্যে টাকা চাইল। আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম, কিন্তু শিক্ষক মানুষ বিপদে পড়েছে, টাকা তো দিতেই হয়।

সেই টাকা তিনি কখনো ফেরত দেননি। বেশি টাকা নয়, কাজেই সেটা নিয়ে আমিও কখনো মাথা ঘামাইনি। আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি শিক্ষক বাবা-মায়ের থেকেও বড়, তিনি যদি তুচ্ছ কয়টি টাকা নিয়ে থাকেন তাহলে কী হয়? কিন্তু এই কয়টি টাকার বিনিময়ে শেফু তার ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলল। যেদিন স্যারের মার খাওয়ার ভয় থাকে সেদিন আগেই গিয়ে কুণ্ঠিত গলায় কাচু মাচু করে বলত, স্যার একটা দরকারি কথা ছিল।

কী কথা।

আম্মা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন, আপনি যে টাকাটা নিয়েছেন সেটা আজকেই ফেরত দিতে হবে।

স্যারের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যেত, দুর্বল গলায় বলতেন, হ্যাঁ মা, এখন তো সাথে নেই, আমি কালকেই নিয়ে আসব। তোর মাকে বলিস–

স্যার টাকা আনতেন না এবং শেফুর মুখে হাসি ফুটে উঠত! স্যার অন্যদের পিটিয়ে রক্তারক্তি করে দিতেন, শেফুকে স্পর্শও করতেন না!

আবার যখন একদিন দোয়া কুনুৎ মুখস্থ করে যাবার কথা এবং শেফুর মুখস্থ হয়নি, ক্লাস শুরু হওয়ার আগে স্যারের কাছে গিয়ে মুখ কাচমাচু করে বলত, স্যার, একটা কথা–

আমি এই ব্ল্যাকমেলিংয়ের খবর পেয়েছি অনেক দিন পর। যখন তারা বড় হয়েছে তখন। সেই দরিদ্র শিক্ষক আজীবন জেনে এসেছে আমি সেই অল্প কয়টি টাকার জন্য তার পেছনে পেছনে জোকের মতো লেগে রয়েছি। তাকে সেটা আর বলা গেল না!

শেফু খুব সুন্দর গান গাইত। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাকিস্তানি মিলিটারি বাসা লুট করে নেয়ার সময় অন্যান্য সব জিনিসের সাথে

হারমোনিয়ামটিও গেছে। স্বাধীনতার পর তার গানের মাস্টারের সাথে দেখা হয়েছে, ছুটে এসে বললেন, বাসা লুট হয়ে গেছে, আহা কী সর্বনাশের ব্যাপার! হারমোনিয়ামটা আছে তো?

হারমোনিয়ামটি ছিল না।

শেফুও আর কখনো গান গায়নি। তার আব্বার খুব শখ ছিল, তার আব্বা নেই, আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্বাধীনতা-উত্তর দেশে বেঁচে থাকার জন্যে সংগ্রাম করে যাচ্ছি, একদিন তার মাঝে তার মিষ্টি গলার গান কেমন করে জানি হারিয়ে গেল।

ইকবাল

আমার মেজো ছেলের জন্ম হয় সিলেটের মীরাবাজার। ডিসেম্বর মাসের এক ভোরে, সকাল ৬টা সাড়ে বাইশ মিনিটে। কাজলের বাবার ডায়রিতে এই নিখুঁত সময়টি লেখা ছিল, কীভাবে এই নিখুঁত সময়টি বের করেছে আমার জানা নেই। এর আগের দুই সন্তানই হয়েছে বাবার বাড়িতে, অসংখ্য লোকজন ছিল আশেপাশে। এবারে নিজেদের লোক নেই, বন্ধুবান্ধব এবং কাদম্বিনী নার্স। সেই নার্স জন্মের পর তাকে ধুয়েমুছে তার বাবার হাতে তুলে দিল, বাবা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল তার ছেলের দিকে।

ছেলে জন্মালে আজান দিতে হয় (মেয়ে হলে কেন নয়?) তাই তার চাচা আজীজ বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আজান দিল। আজান শুনে বুঝতে কারো বাকি নেই, ছুটে এল সবাই। বাচ্চাকে দেখে কারো আর আঁশ মেটে না, ধবধবে গায়ের রং, বড়বড় হাসের ডিমের মতো চোখ, নাদুস নুদুস চেহারা।

খবর পেয়ে আমার বাবা এলেন, শ্বশুর এলেন। দুজনেই নাতিকে দেখে মহা খুশি। শ্বশুর বললেন, আমি বুঝেছিলাম তোমার ছেলে হয়েছে, তোমার শাশুড়ি স্বপ্নে দেখেছে আকাশে মস্ত এক চাঁদ উঠেছে, তখনই বুঝেছি তোমার নিশ্চয়ই একটা ছেলে হয়েছে!

শ্বশুর যাবার আগে আবার আমাকে মনে করিয়ে দিলেন, মনে আছে তো আমি খোদার কাছে ধন চাই নাই, শুধু জন চেয়েছি। এই দেখ খোদা জন দিচ্ছে। দোয়া করি এরা মানুষ হোক।

আজীজ বাচ্চাদের খুব আদর করত। সে অনেক ভাবনাচিন্তা করে ছেলের নাম রাখল ইকবাল আহমেদ। বড় ছেলে হুমায়ূন আহমেদ, মেজো ছেলে ইকবাল আহমেদ, কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়। বেশ কিছুদিন কেটে গেছে তখন

হঠাৎ কাজলের বাবা নিউমারোলজিতে ঝুঁকে পড়ল। কাগজে আঁকিবুঁকি করে, হিসাবপত্র করে বলল, না, নাম ঠিক হয় নাই। নাম পাল্টাতে হবে।

আমি বেঁকে বসলাম, ইকবাল নামটা আমার পছন্দ, কিছুতেই পাল্টাতে দেব না।

অনেক হিসাবপত্র করে সে নামটা ইকবাল আহমেদ থেকে পাল্টে করে দিল জাফর ইকবাল। আমি ডাকি ইকবাল।

বড় দুজন জন্ম থেকে দুরন্ত, সে তুলনায় ইকবাল খুবই শান্ত। আমার ধারণা ছিল দুজন চালাক চতুর বাচ্চার পর সে হয়তো একটু বোকাই বের হয়েছে। কথা বার্তা বিশেষ বলে না। বড় দুজনে যখন জোর করে পড়াতে বসাই সে কাছে চুপ করে বসে থেকে দেখে। একদিন দেখি সে নিজেও বই নিয়ে বসেছে, ভাবলাম ছেলেমানুষি শখ, পড়ার ভান করবে। হঠাৎ দেখি পড়ার ভান নয়, সত্যিই পড়ে যাচ্ছে! তাকে তখনো কোনো অক্ষরজ্ঞান দেয়া হয়নি। নিজে নিজে পড়া শিখে গেছে। বুঝলাম ছেলেটা চুপচাপ হতে পারে, তবে বোকা নয়!

একবার কৌতূহলী হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি রে, তুই কথা বলিস না কেন?

চার বছরের বাচ্চা গম্ভীর হয়ে বলল, বেশি কথা বলে কী লাভ?

শুনে তার আব্বার সে কি হাসি!

কাজল ছেলেবেলা দুষ্টুমি করে কাটিয়ে একটু বড় হয়ে পড়ায় মন দিয়েছে। ইকবাল ছেলেবেলা থেকেই মনোযোগী। পড়াশোনায় ভালো, সারাজীবনই বৃত্তি পেয়ে এসেছে। স্বাধীনতার পর সর্বস্ব হারিয়ে আবার যখন নতুন করে জীবন শুরু করেছি সে তখন আমার কাছ থেকে একটি পয়সাও নেয়নি। প্রাইভেট টিউশনি করেছে, খবরের কাগজে কার্টুন এঁকেছে, টেলিভিশনে বিজ্ঞানের ওপর অনুষ্ঠান করেছে। এমএসসি পাস করার পরের দিন সে আমেরিকা চলে গেল পিএইচডি করতে, তার প্লেনের ভাড়াটাও আমাকে দিতে হয়নি, তার ছেলেবেলার বন্ধু জোগাড় করে দিয়েছে।

শিখু

আমার চার নম্বর সন্তান মেয়ে। তারও জন্ম হয় সিলেটে, ডিসেম্বরের ১৭ তারিখ শুক্রবার। জন্মের পর সে বেশ ভুগেছে। শ্বাশুড়ি কাছে ছিলেন। শুধু মাথা নাড়তেন আর বলতেন, শামসুর মা, বড় ভয় করে। আমারও দুইটা মেয়ে, প্রথমটা ভালোই, দ্বিতীয়টা রোগে ভুগে শেষ হয়ে গেল।

ভয়ে ভয়ে ছেলেবেলাটা কাটিয়ে দেয়া হলো। দেখা গেল ভয় অমূলক। প্রচুর তার প্রাণশক্তি, কথা বলা শুরু করার পর থেকেই তার মুখে খই ফুটছে। হৈ চৈ চেচামেচি করে সে ঘর বাড়ি মাতিয়ে রাখে। কাজেই তার অঘটনও ঘটে বেশি। বাবার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছি কুপি বাতি থেকে দপ করে চুলে আগুন ধরে গেল। সুপারি গাছ থেকে সুপারি পাড়ছে, গাছের নিচে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে উপরে, কোথা থেকে সুপারি এসে পড়ল মাথায়, মাথা ফেটে রক্তারক্তি। বেড়াতে গিয়েছে কার বাসায়, বাসায় বদমেজাজী কুকুর, কাছে গিয়ে জ্বালাতন করেছে আর কুকুর দিয়েছে কামড়ে! এ রকম ঘটনার কোনো শেষ নেই। তার বাবা আগুন ভালোবাসতো মেয়েটার মাঝে আগুনের স্ফুরণ দেখে নাম রেখেছিল শিখা, দীর্ঘদিন ব্যবহারে সেটা এখন হয়েছে শিখু।

বড় হয়েও তার স্বভাবের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। কাপড়ের বাটিক করার জন্যে একদিন তার অনেক কাপড়ের দরকার। নিউমার্কেটে এক দোকানে গিয়ে দরদাম করে পুরো এক থান কাপড় কিনে ফেলল। দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, রং পাকা তো?

দোকানদার বলল, কী বলেন আপা, কাচা রঙের কাপড় আমি বিক্রি করব?

ঠিক বলছেন তো?

ঠিক বলছি।

রং কাঁচা হলে ফেরত নেবেন।

একশ বার।

বেশ, একটা কাগজে এক লাইন লিখে দেন।

দোকানদার সরল মনে কাগজে এক লাইন লিখে দিল।

শিখু বাসায় এসে পানিতে কাপড় ভেজাতেই কাপড় থেকে কাঁচা রং নেমে এল।

শিখু পুরো বালতি নিয়ে নিউমার্কেটে হাজির। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। একটা ছেলে মাথায় বালতি নিয়ে যাচ্ছে, বালতিতে থৈ থৈ পানিতে কাঁচা রং, তার মাঝে এক থান ভেজা কাপড়। কাপড়ের দোকানে গিয়ে কাউন্টারে বালতি নামিয়ে রাখা হলো। লোকজনের ভিড় জমে গেছে তখন। শিখু বলল, আপনি বলেছিলেন রং কাঁচা হলে কাপড় ফেরত নেবেন। রং কাঁচা, কাপড় ফেরত নিয়ে বালতিটা খালি করে দেন।

কিন্তু–

এই যে আপনার হাতে লেখা কাগজ। লিখে দিয়েছিলেন রং কাঁচা হলে ফেরত নেবেন।

তাই বলে এই ভাবে? আগে অল্প একটু ভিজিয়ে পরীক্ষা করতেন।

আপনি বলেছিলেন পাকা রং। আপনার কথা বিশ্বাস করেছিলাম।

এখন এই পুরো থান কাপড় নিয়ে কী করব?

আপনার যা ইচ্ছা। আপনার নিজের মুখের কথা; নিজের হাতে লেখা– শিখু মেজাজ খারাপ করে না, মিষ্টি করে হাসে।

লোকজনের ভিড় জমে গেছে, দোকানদার প্রতিবাদ করার দুর্বল একটা চেষ্টা করে বেশি সুবিধে করতে পারে না, জনতা এখন শিখুর দিকে।

বালতি থেকে ভেজা কাপড় সামলে নিয়ে সেই লোক টাকা গুনে ফেরত দিয়ে দেয়।

এই হচ্ছে শিখু।

শাহীন

আমার তৃতীয় ছেলের জন্মের পর পরই আমরা সিলেট ছেড়ে চলে যাই দিনাজপুরের এক প্রান্তে, জগদল নামে একটা নির্জন জায়গায়। মানুষজন নেই, চারদিকে আমবাগান, তার মাঝে বিশাল এক প্রাচীন জমিদার বাড়ি, সেখানে থাকি। বাসায় একজন পুরানো বাসিন্দা রয়ে গেছে, জমিদারের এক সম্ভ্রান্ত কুকুর। প্লেটে করে না দেয়া পর্যন্ত সে কিছু খেত না, এ ধরনের বড়লোকী হাব-ভাব থাকলেও কুকুরটি ছিল ভালো। আমার সবচেয়ে ছোট ছেলেটার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে সেটা একবার একটা সাপকে কামড়ে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সাপের কামড়ে মুখে ঘা হয়ে পাগল হয়ে যাবার জন্যে এই সম্ভ্রান্ত কুকুরটিকে গুলি করে মারা হয়েছিল।

ছোট ছেলের নাম রাখা হলো শাহীন। তখন বিজ্ঞানী কুদরতে খোদা পাটশলা থেকে পার্টেক্স বের করে অনেক নাম করেছেন, কাজলের বাবা তার নামানুসারে শাহীনের ভালো নাম রাখল কুদরতে খোদা। দীর্ঘদিন পর ছেলেমেয়ে বড় হয়ে নামটি নিয়ে আপত্তি করল, যার নামে রাখা হয়েছে তিনি নমস্য ব্যক্তি কিন্তু তার নামটি প্রাচীনকালের, এ যুগে হাল ফ্যাশনের নাম দরকার। শাহীন যখন ক্লাস ফোরে পড়ে তখন তার নাম আবার পাল্টানো হলো, এবারে নাম ইবনে ফয়েজ মুহম্মদ আহসান হাবীব। যার অর্থ ফয়েজের পুত্র আহসান হাবীব। কাজলের আব্বার মাথায় তখন ইবনে ফয়েজ শব্দ দুটি ঘুরছে, অন্যদের নামের আগেও সেটা জুড়ে দিতে চাইছিল, কিন্তু তখন তারা বেশি বড় হয়ে গেছে তাই রাজি হলো না! শাহীনের নামত দীর্ঘদিন ছিল ইবনে ফয়েজ মুহম্মদ আহসান হাবীব। ঠিক বলতে পারব না কোনো এক সময়ে সে ইবনে ফয়েজ ছেড়ে ফেলে নিজেই তার নাম সংক্ষিপ্ত করে আহসান হাবীব করে ফেলেছে!

আমার এই ছেলেটি অন্যদের থেকে বেশি কষ্ট করেছে। স্বাধীনতার পর অভিভাবকহীন সংসারে নিজে খুঁজে খুঁজে স্কুল বের করে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। প্রচণ্ড অনিশ্চয়তার মাঝে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়েছে, লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে রেশন তুলেছে, বাজার করেছে– এর মাঝে আবার পড়াশোনা করে মানুষ হয়েছে! ছোট ছেলে হলে তাদের অনেক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। একটা উদাহরণ দিই।

আমরা তখন বাবর রোডে থাকি, দিন দুপুরে একটা চোর ধরা পড়েছে। চোর ধরা পড়লে তাকে শক্ত মার দেয়া হয়। নিচে বেঁধে তাকে অমানুষিকভাবে পেটানো হচ্ছে। আমাদের নিচের তালায় একজন মেজর থাকতেন, তিনি খানিকক্ষণ পিটিয়ে এসে আমাকে বললেন, বুঝলেন খালাম্মা, সকালে ডেইলি দুইটা করে ডিম খাই, আমি পর্যন্ত কাবু করতে পারলাম না, টায়ার্ড হয়ে গেলাম!

অসহনীয় দৃশ্য! আমি ছুটে গিয়ে অনেক বলে সবাইকে থামালাম, চোর চুরি করে থাকলে তাকে থানায় দিতে হবে, নিজেরা কেন এত অমানুষের মতো তাকে মারধর করবে? আমার কথায় শেষ পর্যন্ত সবাই থামল। এখন চোরকে থানায় দিতে হবে।

থানায় ফোন করা হলো। কিন্তু পুলিশ বড় বড় সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাদের এই ছিঁচকে চোর নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। বলল থানায় নিয়ে আসতে।

থানায় নিয়ে যাবার কথা শুনে একজন একজন করে সবাই কেটে পড়ল, কাজেই ভার পড়ল আহসানের ওপর। ছোট ছেলে হবার এই হচ্ছে যন্ত্রণা!

চোরকে পিটিয়ে রক্তারক্তি করে ফেলেছে। থানায় নেয়ার আগে তাকে হাসপাতালে নিতে হবে। আহসান তাকে নিয়ে রওনা দিল হাসপাতালে। একটা রিকশা ডেকে থামানো হলো, চোর উদাস গলায় বলল, রিকশা? ভাই, আমি তো স্কুটার ছাড়া যাতায়াত করি না!

আহসান তো চোরের মর্যাদার হানি করতে পারে না, তাকে স্কুটারে করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল আমি জানি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত থানা পর্যন্ত পৌছে দিতে পেরেছিল কিনা আমার জানা নেই।

আহসানও তার অন্যান্য ভাইবোনর মতো ছবি আঁকতে পারে। আর্ট কলেজে পড়েনি কিন্তু ঘরে বসে ছবি আঁকতে আঁকতেই বেশ ছবি আঁকা শিখে গেছে। আজকাল সে চমৎকার কার্টুন আঁকে, এমনিতে উন্মাদ পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক। ব্যাংকের ভালো চাকরি পেয়েছিল করতে রাজি হলো না। দশটা পাঁচটা গত বাধা জীবন তার ভালো লাগে না!

মনি

আমার শেষ সন্তান আবার মেয়ে। যখন তাকে নিয়ে আমি সন্তানসম্ভবা আমার তখন জার্মান মিজেলস হয়েছিল। সন্তানসম্ভবা মায়েদের এর থেকে বড় দুর্ভাগ্য আর কিছু হতে পারে না। আমরা তখন থাকি বান্দরবান। সেখানে তখন ভালো কোনো ডাক্তার নেই, কাজলের বাবা অনেক চেষ্টা করে একজন এমবিবিএস ডাক্তার আনিয়েছিল। ডাক্তার এসে সব দেখে শুনে আমাকে বলল বাচ্চাটি এবরশান করে দিতে।

আমি দুর্বল মানুষ, এত বড় একটি সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। একটি বাচ্চা হচ্ছে একটি জীবন। হাতে ধরে একটি জীবন নষ্ট করে দেব?

বাচ্চার জন্ম হলো, ছেলের পর মেয়ে, মেয়ের পর ছেলে, হিসেব ঠিক রেখে সত্যিই মেয়ে হয়েছে। ফর্সা, রোগা, মাথা ভরা কাল চুল। রুগ্ন মেয়েটি বাঁচবে সে রকম বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু বেঁচে গেল। ডাক্তারের কথা সত্যি বের হয়েছে, মেয়েটি আমার মূক এবং বধির।

সবার ছোট বলে অন্য পাঁচজনের আদরে বড় হয়েছে, সোনা মনি ডাকতে ডাকতে এক সময়ে দেখা গেল তার নাম হয়ে গেছে মনি। ভালো নাম রাখার সময় এবারে বাচ্চারা দায়িত্ব নিয়ে নিল, বাবার নামের সাথে মিলিয়ে রাখল রোখসানা আহমেদ।

মনি কথা বলতে পারে না সত্যি কিন্তু বুদ্ধিমতী, মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। অগোছাল এবং কিছু পরিমাণ নোংরা ভাইদের দায়িত্ব সে বেশ হাসিমুখেই নিয়েছিল। একটা দৃশ্য মনে পড়ে, ময়লা কাপড় ধোয়া হচ্ছে, মনি তখন ছোট, কাঠিতে গেঁথে তার কোনো এক ভাইয়ের একটা ময়লা গেঞ্জি নিয়ে এল ধোয়ার জন্যে!

মূক আর বধির বাচ্চাদের বিশেষ স্কুলে পড়তে হয়, বদলির চাকরিতে সব

সময় সব জায়গায় সে রকম স্কুল ছিলও না। দরিদ্র দেশ সুস্থ সবল বাচ্চাদের দায়িত্ব নিতেই হিমশিম খেয়ে যায়, মূক আর বধিরদের কথা ছেড়েই দিলাম। বগুড়ায় মূক ও বধির বাচ্চাদের ভালো স্কুল ছিল, স্কুলের দালানটিও ছিল মস্ত বড়। দীর্ঘদিন পরে একবার বেড়াতে গিয়ে দেখি সেই চমৎকার দালানটি সেনাবাহিনী নিয়ে গেছে, ছোট ছোট মূক-বধির বাচ্চারা নির্বাসিত হয়েছে নড়বড়ে ভাঙ্গা একটা বাড়িতে। এ রকম পরিবেশেই যেখানে সম্ভব হয়েছে সে স্কুলে গেছে। কিছু স্কুলে, কিছু নিজের চেষ্টায়, কিছু অন্য সবার সাহায্যে সে বাংলা লিখতে-পড়তে শিখেছে। ভালো স্কুলের অভাবে বাচনভঙ্গি পরিষ্কার হয়নি, কিন্তু মোটামুটি লিপ রিডিং করতে পারে। চমৎকার ছবি আঁকে, ছেলেবেলায় ছবি এঁকে সে একবার শংকর পুরস্কারও পেয়েছিল।

বড় হবার পর স্বপন নামে তার মতো আরেকজন মূক আর বধির ছেলের সাথে তার বিয়ে দেয়া হয়েছে। স্বপন ওষুধের কোম্পানিতে কাজ করে, মনি বাসায় ঘরকন্নার কাজ দেখে, অবসর সময় চমৎকার কাপড়ের পুতুল তৈরি করে। আমার বাসার ওপর তাদের দুজনার ছিমছাম চমৎকার সংসার। সবার ভালোবাসা নিয়ে বেশ দিন কেটে যাচ্ছে।

মনে হয় জন্মের আগেই পৃথিবীর আলো থেকে তাকে সরিয়ে না নিয়ে তার ওপর বড় কোনো অবিচার করিনি।

জগদল

বিয়ের পর আমার জীবন শুরু হয় সিলেটে। সিলেট দীর্ঘদিন ছিলাম, সেখান থেকে গিয়েছি জগদল নামে দিনাজপুরের একেবারে উত্তরে সীমান্তের কাছাকাছি এক জায়গায়। মানুষজন নেই, ভারি নিরিবিলি একটা এলাকা। চারপাশে আমের বাগান, কাছেই নদী, নদীর পানি কাচের মতো স্বচ্ছ। যে জমিদার বাড়িতে আমরা থাকতাম, তাকে নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। একটি এ রকম:

একজন হিন্দু মানুষের কোনো ছেলেমেয়ে হয় না, অনেক রকম মানত করেও কোনো কাজ হলো না। তখন সে মানত করল তার সন্তান হলে সে একটা গরু কোরবানি দেবে।

খোদা নিশ্চয়ই রহস্য পছন্দ করেন, কারণ বছর ঘুরতেই তার স্ত্রীর কোলজুড়ে বাচ্চা এল। হিন্দু ভদ্রলোক তখন কোরবানি দেয়ার জন্যে গরু কিনেছে কিন্তু স্থানীয় মুসলমানরা বেঁকে বসেছে। হিন্দু মানুষ কোরবানি দেবে কি? সেই লোক এসে জমিদারের শরণাপন্ন হলো।

জমিদার নিজে হিন্দু, মুসলমান ধর্মের বিশেষ কিছু জানেন না। কাজেই বিলেত থেকে কোরান শরীফ তরজমা আনালেন। তারপর খুটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে বললেন, অন্য ধর্মাবলম্বীর যদি কোরবানি দিতে চায় সেটা দিতে পারে। মুসলমান ধর্মে এ ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ নেই। কিছু কিছু মুসলমান তার কথা বিশ্বাস করল, কিছু কিছু করল না। সেই থেকে সে এলাকার মুসলমানরা দুই দলে বিভক্ত!

পচাগড়

জগদল থেকে আমরা এলাম পচাগড়। চমৎকার জায়গাটির নামের মাঝে পচা শব্দটি কেন কে বলতে পারবে? জগদলে কোনো স্কুল ছিল না বলে বাচ্চারা মহা সুখে ছিল, পচাগড়ে এসে তাদের সেই সুখ শেষ! সবাই স্কুলে ভর্তি হলো।

পচাগড়ে খুব বেশিদিন থাকিনি। যতদিন ছিলাম বেশ সুখেই ছিলাম। সেখানকার অনেক মানুষ দেশ ভাগের পর এসেছে, ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা তাদের অনেকের জীবনের সবকিছু শেষ হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের বাসায় দুধ দিত যে মানুষটি তার নাম ছিল মুতু মুহম্মদ। কারো যে এরকম নাম হতে পারে নিজে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতাম না। একদিন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, এ রকম নামটি তাকে কে দিয়েছে?

সে বলল তার আসল নাম মুতু। আগেও কিছু নেই, পিছেও কিছু নেই, শুধু মুতু। নামটি অবশ্যি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ সত্যিই ছেলেবেলায় সে প্রতিরাতে বিছানায় পেচ্ছাব করে দিত। তার জীবন এই সংক্ষিপ্ত নামটি দিয়েই বেশ চলে যাচ্ছিল কিন্তু এর মাঝে একটা ঝামেলা শুরু হয়ে গেল। এই এলাকার কোর্টে কেস উঠেছে, আসামি, বাদী, বিবাদী, সাক্ষী সবাই হাজির। দেখা গেল নাম দেখে বোঝার সাধ্যি নেই কে মুসলমান কে হিন্দু! ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট আইন করে দিল যারা মুসলমান এখন থেকে তাদের নামের পেছনে মুহম্মদ কথাটি জুড়ে দিতে হবে। কাজেই মুতুকেও নামের শেষে মুহম্মদ লাগিয়ে মুতু মুহম্মদ হতে হয়েছে!

রাঙ্গামাটি

পচাগড় থেকে রাঙ্গামাটি। রাঙ্গামাটি পাহাড়ি এলাকা, তখন থাকা-খাওয়ার খুব একটা সুবিধে ছিল না। কিন্তু জায়গাটি ছিল অপূর্ব। আমাদের বাসা ছিল টিলার ওপর, নিচে দিয়ে ছোট রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে, একেবারে ছবির মতো দৃশ্য। পাশাপাশি অনেকগুলো বাসা ছিল, একরাতে আমাদের এক প্রতিবেশীর বাসায় আগুন ধরে গেল। পাহাড়ি এলাকা, পানির কোনো ব্যবস্থা নেই, দেখতে দেখতে চোখের সামনে সেই বাসা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বাসার সবাই যে কাপড় পরে ঘুমিয়েছিল সেগুলো ছাড়া তাদের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। বগুড়াতেও এই পরিবারটির সাথে আমরা একসাথে ছিলাম, দুর্ভাগ্য তখনো তাদের স্পর্শ করেছে। তাদের অল্প বয়সী মিষ্টি একটা মেয়ে রোগে ভুগে মারা গেল, আরেকটি মেয়ে মারা গেল বিয়ের পর, হঠাৎ করে পায়ের কাপড়ে আগুন লেগে।

আমরা খুব বেশি দিন রাঙ্গামাটি ছিলাম না। আশেপাশে কোনো স্কুল নেই, বাচ্চাদের পড়াশোনারও কোনো ব্যবস্থা নেই। বাচ্চারা মহাখুশি কিন্তু ঠিক সেই কারণেই আমরা সেখানে বেশি দিন থাকতে চাইলাম না। রাঙ্গামাটি থেকে আমরা সিলেটে ফিরে এলাম।

বান্দরবান

সিলেটে বছর দুয়েক থেকে আমরা গেলাম বান্দরবান। বান্দরবান চমৎকার জায়গা, নদী, পাহাড় বন আর উপজাতীয় মানুষের এক চমৎকার সমাবেশ। বাসার সামনে স্কুল। বাচ্চারা সেই স্কুলে ভর্তি হয়েছে। পাশের বাসায় কাজলের আব্বার অফিসের রিডার তার পরিবার নিয়ে থাকেন। ভদ্রলোক বদলি হয়েছেন, কিন্তু এই জায়গাটির জন্যে মায়া পড়ে গেছে, কাজলের আব্বাকে বলে অনেক কষ্ট করে এখানেই থেকে গেলেন। হিন্দু ভদ্রলোক, তার দুই ছেলে, বড় জন হালকা পাতলা, ছোটজনের পেটা শরীর লাফ ঝাঁপ দৌড় নিয়ে থাকে। স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা এসেছে, সে পরীক্ষা দিতে যাবে বিছানাপত্র বাঁধা হয়েছে। ঠিক তখন মাছ ধরতে গিয়ে দক্ষ সাঁতারু সেই ছেলেটি নদীর ঘূর্ণির মাঝে আঁকা পড়ে পানিতে ডুবে গেল। দীর্ঘ সময় পর তার শরীর পানি থেকে তোলা হয়েছে, দেহে তখন তার প্রাণ নেই। আমাদের সবার জন্যে পুরো ব্যাপারটি একটা ভয়ানক আঘাতের মতো এল। একটু আগেই যাকে দেখেছি প্রাণশক্তিতে ভরপুর, তার মৃতদেহ একটি খাটিয়াতে শুইয়ে নিয়ে আসার মতো ভয়ানক ব্যাপার কি হতে পারে? ছেলেটির শেষকৃত্য হওয়ার পর শ্রাদ্ধের দিনে, স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা হঠাৎ করে বেঁকে বসল, তারা বলল মৃতদেহ নদীর পানি থেকে উদ্ধার করেছে মুসলমানেরা, মুসলমানের হাতের স্পর্শে এই ব্রাহ্মণ তরুণের দেহ অশুচি হয়ে গেছে, তার শ্রাদ্ধ করা যাবে না।

কাজলের বাবার কাছে খরব আসতেই সে গোঁড়া ব্রাহ্মণদের কাছে খবর পাঠাল যে, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে বাধা দিলে এলাকার শান্তি নষ্ট করার জন্য তাদের ধরে এনে বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

খবরটিতে ম্যাজিকের মতো কাজ হলো, হতভাগ্য তরুণটির শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সুচারুভাবে শেষ হয়ে গেল।

বান্দরবনে থাকাকালীন কাজলের বাবাকে প্রায়ই মফস্বলে যেতে হতো। যাওয়ার বাহন নৌকা না হয় হাতি। যেখানে যেত সেখানে আরাকান থেকে ডাকাতেরা আসত, প্রায়ই তাঁদের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হতো। আমরা থাকতে থাকতেই তিনজন পুলিশ মারা গেল একবার। কাজলের বাবা মফস্বলে গেলে সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি তাই অত্যন্ত মানসিক অশান্তিতে থাকতাম।

মফস্বলে গিয়ে ব্যবহার করার জন্যে যেসব হাতি ছিল, তার মাঝে একটার নাম ছিল লাল বাহাদুর। হাতিটি বুড়ো হয়ে গেছে বলে মাসে পনেরো টাকা করে পেন্সন দেয়া হয়। হাতিটি এক অজ্ঞাত কারণে শ্বেতাঙ্গ সহ্য করতে পারে না। দীর্ঘদিন আগে বাদশাহ হোসেনের এক ভাইকে নিয়ে চট্টগ্রামের এক শ্বেতাঙ্গ ডেপুটি কমিশনার শিকারে গিয়েছিলেন। কারো কথা না শুনে লাল বাহাদুরকে তিনি পছন্দ করে তার উপরে বাদশাহ হোসেনের ভাইকে নিয়ে উঠেছেন। বনের ভেতর গিয়ে লাল বাহাদুর হঠাৎ ক্ষেপে গেল, গা ঝাঁড়া দিয়ে ফেলে দিল নিচে, তারপর শুধু শ্বেতাঙ্গ ডেপুটি কমিশনারের বুকে পা দিয়ে তাকে পিষে মেরে ফেলল সবার চোখের সামনে।

কথায় বলে হাতির স্মরণশক্তি নাকি খুব ভালো, কে জানে হয়তো লাল বাহাদুর চোখের সামনে কোনো শ্বেতাঙ্গ মানুষকে কোনো ধরনের নিষ্ঠুরতা করতে দেখেছিল। আজীবন সে সেটা মনে রেখেছে, যখন সুযোগ পেয়েছে তার প্রতিশোধ নিয়েছে।

কে বলতে পারবে?

চট্টগ্রাম

বান্দরবন থেকে আমরা এলাম চট্টগ্রাম। দীর্ঘদিন ছোট ছোট জায়গার পর একটা বড় শহর। বাসার কাছে কলেজিয়েট স্কুল সেখানে ভর্তি হলো কাজল। শেফু আর ইকবাল প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে। কাজলের পড়াশোনায় তেমন গা ছিল না, করতে হয় সে জন্যে করে। কলেজিয়েট স্কুলে এসে হঠাৎ করে পড়াশোনায় মন দিয়েছে। পরীক্ষায় ভালো করায় সে হঠাৎ করে ক্লাস এইটে বৃত্তি পরীক্ষার সুযোগ পেয়ে গেল। এবারে সত্যি মন দিয়েছে পড়াশোনায় কিন্তু কপাল খারাপ ঠিক পরীক্ষার আগে আগে তার জ্বর। শুধু জ্বর নয়, পরদিন দেখা গেল সারা গা জুড়ে জলবসন্ত বের হয়েছে। আর বুঝি তার পরীক্ষা দেয়া হলো না। এত যত্ন করে পড়াশোনা করেছে, পরীক্ষা দিতে না পারলে তো দুঃখেই মরে যাবে।

কাজলের আব্বা খোঁজ নিয়ে বের করল যে বিশেষ অনুমতি নিয়ে সিক বেডে পরীক্ষা দেয়া যায়। দৌড়াদৌড়ি করে সে অনুমতি আনতে গিয়েছে, কিন্তু যার দায়িত্ব সে কিছুতেই অনুমতি দেবে না। উল্টো বলল, আপনার ছেলে কি নদীয়ার চাঁদ নাকি যে বিছানায় শুয়ে পরীক্ষা দেবে?

কাজলের আব্বা তো রেগে মেগে আগুন। পারলে লোকটিকে কাঁচা ধরে খেয়ে ফেলে, বলল, হ্যাঁ আমার ছেলে নদীয়ার চাঁদ। কিন্তু সে জন্যে আপনার কাছে আমি আসিনি। আমি এসেছি কারণ আইন আছে অসুস্থ ছেলে সিক বেডে পরীক্ষা দিতে পারে– আমার ছেলে অসুস্থ, অনুমতি দিতে হবে।

শেষ পর্যন্ত অনুমতি জোগাড় করে এনেছিল এবং কাজল অসুস্থ অবস্থাতেই বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছিল। পরীক্ষাতে সে প্রথম গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছিল।

সেই থেকে তার পড়াশোনার শুরু।

বগুড়া

চট্টগ্রাম থেকে আমরা গিয়েছি বগুড়াতে। বগুড়ায় আমাদের বাসার ভেতরে একটা গোলাপ গাছ, কোনো গন্ধ নেই কিন্তু মস্ত মস্ত গোলাপ ফুল ফুটে থাকত। সকালে উঠে ফুলগুলো দেখলেই মনটা ভালো হয়ে যেত। বাসার আরেক পাশে একটা শিউলি ফুলের গাছ, আগে যিনি ছিলেন কেটে রেখে গেছেন। আমরা থাকতে সেই গাছে আবার পাতা বের হলো। শরৎকালে সেখানে ফুল এল। সন্ধ্যে হতেই ফুল ফোটা শুরু হতো সাথে কি মিষ্টি গন্ধ। ভোরবেলা উঠে দেখতাম উঠোন ভরে আছে শিউলি ফুলে। দিনের আলোতে যেন লজ্জা পায় ফুলগুলো। ঝাঁটা দিয়ে ফুলগুলোকে যখন সরিয়ে ফেলত আমার এমন কষ্ট বলার নয়। আমি শেফালী গাছের নিচে রোদে পা মেলে সোয়েটার বুনতাম আর কয়টা বিড়ালের বাচ্চা উলের গুটি নিয়ে খেলত। বেশ ছিল সময়টা।

কাজলের বাবার খুব লেখার শখ ছিল। সময় পেলেই লিখত। বেশ ভালোই লিখত, পত্রপত্রিকায় ছাপা হতো সেগুলো। বগুড়ায় হঠাৎ করে ঠিক করল সে তার একটা ছোটগল্পের বই বের করবে। প্রিয় গল্পগুলো বেছে পাণ্ডুলিপি তৈরি করে বইয়ের নাম দিল 'দ্বীপ নেভা যার ঘরে'। প্রচ্ছদ তৈরি হলো, ছাপা শুরু হলো এবং একদিন রিকশা করে সে বাসায় ছয়শো কপি 'দ্বীপ নেভা যার ঘরে' নিয়ে হাজির হলো।

সেই বই বাসাতেই পড়ে রইল দীর্ঘদিন। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন এলে তাদেরকে এক কপি করে বই দেয়া হতো। স্বয়ং লেখকের নিজের হাতের স্বাক্ষর নিয়ে সবাই সেই বই নিয়ে যেত খুব আগ্রহ করে।

তার লেখার ক্ষমতা তার সন্তানেরাও পেয়েছে। কেউ বেশি কেউ কম। কেউ ব্যবহার করেছে, কেউ করেনি।

এর মাঝে কাজলের স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা। কাজল রাত জেগে জেগে পড়াশোনা করে। গভীর রাতে যখন শুতে যায় মাঝে মাঝে তার ঘুম আসে না। একদিন আমাকে বলল তার জন্যে ঘুমের ওষুধ এনে রাখতে। এইটুকু বাচ্চা ছেলে ঘুমের ওষুধ কি খাবে? আমি দোকান থেকে এসপিরিন কিনে প্যাকেট থেকে খুলে সাদা কাগজে মুড়ে তাকে দিয়েছি। সে গভীর বিশ্বাসে সেই ওষুধ তার বালিশের নিচে রেখে দিল। রাতে ঘুম না এলে সে ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে যেতে পারবে সেই বিশ্বাসেই। এর পর প্রতি রাত নাক ডেকে ঘুমাতে লাগল। কোনোদিন বালিশের তলা থেকে সেই ওষুধ বের করে তার খেতে হয়নি!

সে সময়ে আমাদের বাসায় কোনো বড় ঘড়ি নেই। সারা বাসায় কাজলের বাবার একটা হাতঘড়ি, সে অফিসে যাবার পর ঘড়ি দেখতে হলে বাড়িওয়ালার বাসায় গিয়ে তাদের দেয়ালঘড়ি দেখে আসতে হয়। একদিন কাজলের আব্বা তাই একটা ঘড়ি কিনে আনল। কাল রঙের বড় দেয়ালঘড়ি। সব ছেলেমেয়ে মুগ্ধ হয়ে সেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইল, হাঁ করে বসে রইল কখন ঘণ্টা বাজবে! সন্ধ্যেবেলা দেয়ালে ঘড়ি লাগানো হয়েছে, ঘুমানোর সময় দেখা গেল উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সবারই কম বেশি ঘাড়ে ব্যথা! ঘড়িটির জন্যে বাচ্চাদের যে ছেলেমানুষি ভালোবাসা জন্মেছিল সেটি এখনো আছে, তবে অন্য কারণে।

স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা দিয়ে কাজল আমাদের জানাল তার পরীক্ষা বেশ ভালো হয়েছে। কত ভালো হয়েছে আমরা জানতে পারলাম বেশ আকস্মিকভাবে। ছোট ভাইয়ের বিয়েতে মোহনগঞ্জ গিয়েছি, বিয়ে বাড়ির হৈ চৈ তার মাঝে একটা রেডিও বাজছে। হঠাৎ করে রেডিওতে ঘোষণা করল, রাজশাহী বোর্ডের স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা হয়েছে। পরীক্ষায় বোর্ডের মাঝে প্রথম হয়েছে অন্য একজন, দ্বিতীয় হয়েছে হুমায়ূন আহমেদ!

ছেলে এত ভালো করেছে তাকে তো আর স্থানীয় কলেজে দেয়া যায় না। তাই চিন্তাভাবনা করে তাকে ঢাকা কলেজে ভর্তি করা হলো। সাউথ হোস্টেলে থাকে। সাথে তার মামা রুহুল আমীন, সেও সে বছর স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাস করেছে।

আমাদের ছেড়ে ঢাকা চলে যাবার পর বুঝতে পারলাম ছেলে আমার বড় হয়ে গেছে।

কুমিল্লা

বগুড়া থেকে আমরা গেলাম কুমিল্লা। কাজলের বাবা প্রমোশন পেয়ে ডিএসপি হয়েছে। সবাই খুব খুশি। কুমিল্লায় আমাদের বাসাটিও চমৎকার। বড় দোতালা বাসা, বাসার পেছনে বড় পুকুর। ইকবাল আর শেফু কলেজে। শিখু, শাহীন স্কুলে। বাসার ভেতরে জায়গা রয়েছে আমি কয়েকজনের বুদ্ধি শুনে একটি গরু কিনে ফেললাম! বেশ কিছু হাঁসও আছে। বাসার পেছনে পুকুর। সেই পুকুরে হাঁস ঘুরে বেড়ায়। হাঁসগুলোর একটা বিচিত্র অভ্যাস, কাজল যখন ছুটি ছাটাতে বাসায় আসে তখন সেগুলো ডিম পাড়া শুরু করে! সে চলে গেলে ডিমও বন্ধ।

দীর্ঘদিন পর জেনেছি যে কাজল লুকিয়ে ডিম কিনে এনে হাঁসের ঘরে রেখে দিত। সে বাজার ঘুরে চেষ্টা করত পচা ডিম কেনার জন্যে, কিন্তু পচা ডিম পাওয়া নাকি ভারি কষ্ট!

তখন ইকবাল ঢাকা কলেজে। একবার তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে বেড়াতে এসেছে। কাজলও আছে, সবাই মিলে ঠিক করল প্ল্যানচেট করে মৃত মানুষের আত্মা আনা হবে। আমাদের বাসায় প্ল্যানচেট ইত্যাদি নতুন কিছু ব্যাপার নয়। যা কিছু অস্বাভাবিক তাতেই সবার কৌতূহল। কাজল অবশ্যি কোনো ঝুঁকি নিল না, প্ল্যানচেট করলেই যে বিদেহী আত্মা হাজির হবে তার কি নিশ্চয়তা আছে? সে ইকবাল আর তার বন্ধুদের গোপন করে বাসার অন্য সবাইকে নিয়ে ভূত আনার একটা নিখুঁত পরিকল্পনা করে তৈরি হয়ে রইল। যথা সময়ে প্ল্যানচেট করতে বসেছে এবং পরিকল্পনামাফিক সত্যি সত্যি একটা ভয়াবহ প্রেতাত্মা এসে হাজির! প্রথমে দপ করে একসাথে সব মোমবাতি নিভে গেল, সাথে সাথে বাসার ছাদে দুপদাপ শব্দ, ঝড় নেই বাতাস নেই গাছ নড়তে শুরু করল। শুধু তাই নয় আলাদা ঘরে শোওয়া বৃদ্ধ আর্দালি চিৎকার করে ছুটে এল তার ঘরে, লম্বা একটা কি জিনিস দাঁড়িয়ে নাকি তার নাক স্পর্শ করার চেষ্টা করছে!

পরদিন ভোরে ইকবাল এবং তার বন্ধুদের চেনা যায় না, আতঙ্কে সারা রাত ঘুমায়নি, চোখ লাল, চুল উস্কখুস্ক, উদভ্রান্তের মতো চেহারা। তারা সেদিনই ঢাকা ফিরে গেল।

আমার ছেলেমেয়েদের দুষ্টু বুদ্ধির কোনো শেষ নেই। একুশে ফেব্রুয়ারিতে আশেপাশের অনেককে নিয়ে প্রভাতফেরিতে বের হবে। ইকবাল বলল সে ভোরে ঘুম থেকে উঠতে পারে না, কাউকে ডেকে তুলতে হবে। পাশের বাসার একটি মেয়ে ডেকে তোলার দায়িত্ব নিল। ইকবাল বলল, বাসায় বড়দের ঘুম ভাঙিয়ে লাভ নেই সে পায়ে বেঁধে একটা লম্বা দড়ি দোতলা থেকে ঝুলিয়ে দেবে, নিচে থেকে সে দড়ি ধরে টান দিলেই তার ঘুম ভেঙে যাবে।

মেয়েটি সরল বিশ্বাসে ভোররাতে এসে অন্ধকারে হাঁতড়ে হাঁতড়ে সেই দড়ি বের করে টান দিয়েছে। ইকবাল দড়ির সাথে বেঁধে রেখেছে একটা বালিশ, সেই বালিশ ধপাস করে এসে পড়ল নিচে! মেয়েটি আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে ছুটতে লাগল রাস্তায়, তার ধারণা হলো বেশি জোরে টান দিয়ে সে ইকবালকেই দোতলা থেকে ফেলে দিয়েছে।

কুমিল্লা থেকে কাজলের বাবা এসডিপিও হয়ে পিরোজপুর বদলি হলো। খবার পেয়ে আমার শ্বশুর বললেন, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। আমার হিসেবে কিন্তু তার ডিএসপিই থাকার কথা। আমাদের সাথে তখন কাজলদের এক চাচাতো ভাই ফরহাদ থাকত। আমার শ্বশুর তাকে আমাদের সাথে পিরোজপুর যেতে দিলেন না, তাকে গ্রামে ফিরিয়ে নিলেন। পারলে তিনি আমাদের কাউকেই সেখানে যেতে দিতেন না, কিন্তু সেটা তার হাতে ছিল না।

ঠিক কেন জানি না, তার মনে হলো পিরোজপুরে যাওয়াটা আমাদের জন্যে ভালো হলো না।

পিরোজপুর

পিরোজপুরে আমাদের বাসাটি ছিল পুরানো, চুনবালি খসে পড়ছে। তবে সামনে খোলামেলা একটি পুকুর থাকায় আরো বেশি খোলামেলা মনে হতো। ভেতরে প্রচুর জায়গা, বড় বারান্দা রয়েছে। একটা ছোট হরিণ জোগাড় করা হয়েছে সেটা হাঁটি হাঁটি পা পা করে ঘুরে বেড়ায়। বড় ছেলেমেয়ে তিনজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছোট তিনজন আমাদের সাথে। ছুটি ছাটায় সবাই মাঝে মাঝে একসাথে হয়। তখন হৈ চৈ করা হয়। একটা বড় আনন্দ হচ্ছে সবাই মিলে নৌকা করে বের হওয়া। বড় নদীর মাঝে নৌকা করে বের হলেই মন কেমন জানি উদাস হয়ে যায়, কাজলের বাবা আরো খেয়ালি মানুষ সে আরো কেমন জানি চুপচাপ হয়ে যায়। একবার ধলেশ্বরী নদীতে সবাই মিলে নৌকা করে যাচ্ছি, কাজলের বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমার কী মনে হয় জান?

কী?

নদীর এই তীরটা হচ্ছে জীবন। আর অন্য তীরটা হচ্ছে মৃত্যু। আমরা সবাই জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে যাচ্ছি!

সে কেন এই কথাটি বলেছিল জানি না, কিন্তু সত্যি সত্যি এই নদীর তীরটি তার জন্যে ছিল মৃত্যু, এই নদী তীরেই তাকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোকেরা গুলি করে হত্যা করেছিল, আর এই নদীর পানিই তার দেহকে বুকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

তখন তার কথা আমি গুরুত্ব দিইনি। ভাবুক গোছের এই মানুষটি তো আরো কত কথাই বলে! তাকে মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে আনতে বেশি দেরি হয় না, হারমোনিয়াম বের করে গান হয়, কবিতা আবৃত্তি হয়, ফ্লাক্স বের করে চা খাওয়া হয়।

মনে হয় বেঁচে থাকাটা মন্দ ব্যাপার নয়।

১২ নভেম্বর

সকাল থেকে ঝড়ো হাওয়া, সাথে ঝির ঝির বৃষ্টি, চারদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব। অন্ধকার হতে হতে আবহাওয়া খুব খারাপ হয়ে গেল। শনশনে বাতাস বইছে, গাছগাছালি প্রবল বাতাসে মাথা কুটছে। সম্ভবত পূর্ণিমার রাত ছিল, মেঘে আকাশ ঢাকা তাই চাঁদ দেখা যায় না কিন্তু চাঁদের আবছা আলোতে চারিদিক কেমন যেন অশরীরী দৃশ্যের মতো দেখা যায়। সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া করে সবাই চুপচাপ বসে আছে। কাজলের শরীর খারাপ, সে কিছু খায়নি। রাত আরো গভীর হলো মনে হচ্ছে প্রচণ্ড বাতাসে বিশ্ব সংসার উড়িয়ে নেবে। এই ভয়ানক সময়ে কাজলের খিদে পেয়ে গেল। রান্নাঘরে যাবার উপায় নেই, সেটা বাসা থেকে আলাদা, বাসার চারদিকে নারকেল গাছ, ধুপধাপ করে নারকেল পড়ছে। ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে, হারিকেন জ্বালানো হয়েছে তাই। একটা কেরোসিনের চুলা জ্বালিয়ে তাকে কোনোমতে একটু খাবার তৈরি করে দেয়া হলো।

ভোরবেলা বাসা থেকে বের হয়েছি। বাসার চারদিকে নারকেল পড়ে আছে। কাজলের আব্বা বললেন, কাল খবরের কাগজে দেখব মানুষও এমনিভাবে মরে পড়ে আছে।

সত্যি তাই হলো, আস্তে আস্তে খবর এল লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে। কাজলের আব্বা চলে গেল রিলিফের কাজে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান চীন থেকে ফিরে আসছিল, এ দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সোজা পশ্চিম পাকিস্তান ফিরে গেল। মওলানা ভাসানী উপকূল এলাকায় গিয়েছেন, চিৎকার করে বললেন, কেন সরকার এসে নিজের চোখে দেখে না? ঢাকাতেও প্রচণ্ড হৈ চৈ হলো, ইয়াহিয়া খান বললেন তিনি আসবেন।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসছেন কত বড় কথা। রাস্তায় গাড়ি চলে না,

রিলিফ বন্ধ করে রাস্তা তৈরি হলো। একটা লাশ তুলে তাকে দামি কাফনের কাপড় পরানো হলো। গোলাপ জল আতর লোবান দিয়ে ঢেকে রাখা হলো। আগ থেকে কবর খুঁড়ে রাখা হলো এক অবস্থাবান মানুষের বাড়িতে! প্রেসিডেন্ট নিজের হাতে এই মহাসৌভাগ্যবান মানুষটিকে কবর দেবেন, রেডিও টেলিভিশন খবরের কাগজে সেই খবর প্রচারিত হবে, পৃথিবীর মানুষ ধন্য করবে।

প্রেসিডেন্ট সময়মত পৌঁছাতে পারলেন না। দেশের একজন প্রেসিডেন্ট কত রকম দায়িত্ব থাকে, সময়মতো পৌঁছাতে না পারাই স্বাভাবিক। সবাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু সারা দিন গেল প্রেসিডেন্টের দেখা নেই। মৃতদেহ বাইরে ফেলে রাখা যায় না, কিন্তু প্রেসিডেন্টের জন্য রাখা মৃতদেহ কার সাহস আছে সেটা কবর দিয়ে দেয়? একদিন পার হয়ে গেল তবু প্রেসিডেন্ট আসেন না, মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে আতর লোবানেও আর ঢেকে রাখা যাচ্ছে না কিন্তু সেটাকে কবর দেয়ার হুকুম নেই।

দুর্ভাগা এই মানুষটির দেহ দামি কাফনের কাপড়ে আবৃত হয়ে ধীরে ধীরে পচে যেতে শুরু করেছে। আশেপাশে কেউ থাকতে পারে না। অনুমতির অভাবে সেটাকে কবরও দেয়া যাচ্ছে না।

প্রেসিডেন্ট শেষ পর্যন্ত আসেননি, এই গলিত মৃতদেহ প্রেসিডেন্ট ছাড়াই দাফন করা হয়েছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব হঠাৎ করে আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের কাছেও স্পষ্ট হয়ে যায়।

কাজলের বাবা ফিরে এল পনেরো দিন পর। শুকনো মানুষ আরো শুকিয়ে গেছে, দেখে আর চেনা যায় না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কি অবস্থা তোমার? খাওয়া দাওয়া করনি সেখানে।

সে আস্তে আস্তে বলল, তোমাদের চোখে দেখতে হয়নি খুব ভালো আছ।

কেন কী হয়েছে?

বিশ্বাস করবে না, না দেখলে। নদীর ঘাটে কচুরিপানার মতো এসে লেগে আছে মরা লাশ। ছোট বাচ্চা, গরু বাছুর, পশু পাখি-ইশ কি কষ্ট! লাশ পচে কি দুর্গন্ধ, খাওয়ার কথা ভাবা পর্যন্ত যায় না।

আমি কিছু না বলে চুপ করে রইলাম। কী বলব?

২৫ মার্চ

একাত্তর সালে আমার তিন ছেলেমেয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। কাজল কেমিস্ট্রিতে, শেফু বাংলায় আর ইকবাল ফিজিক্সে। মার্চ মাসে যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলো তখন তারা তিনজনই ঢাকায়, মেজো মেয়ে শিখু স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা দেবার জন্য কুমিল্লায়। আমাদের দুশ্চিন্তার সীমা নেই। প্রায় প্রত্যেক দিনই শুনি মিলিটারির সাথে গোলমাল, প্রত্যেক দিনই শুনি কেউ না কেউ গুলি খেয়ে মারা যাচ্ছে। কাজলের আব্বা খুব চিন্তিত, বেশি কথাবার্তা বলে না। প্রায় সময়েই দেখি মনে মনে পড়ছে, 'ফাবে আইয়ে আলা রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান'-তোমার কোনো নিয়ামত আমি অস্বীকার করব?

আজ হরতাল, কাল কারফিউ, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে আছে তখন একদিন একসাথে ঢাকা থেকে তিন ছেলেমেয়ে এসে হাজির। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ইকবাল তখন গেল কুমিল্লায়, সেখানে শিখু ফরিদা বিদ্যায়তনের হেড মিস্ট্রেস সেলিনা বানুর বাসায় থেকে পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এখন যে অবস্থা পরীক্ষার কথা পরে ভাবা যাবে। তাকে নিয়ে আসার পর অনেক দিন পর আমরা পুরো পরিবার একসাথে হয়েছি। দেশে তখন থমথমে আবহাওয়া তার মাঝে আমার বাসায় অনেক দিন পর বেশ একটা উৎসবের পরিবেশ হয়ে উঠল। কাজলের বাবা সবগুলো ছেলেমেয়েকে একসাথে পেয়ে খুব খুশি হয়ে উঠল। মানুষটার মন ভালো থাকলে কয়েকটা জিনিস করত, তার মাঝে একটা হচ্ছে কবিতা আবৃত্তি। অসংখ্য কবিতা মুখস্থ ছিল, তার মাঝে একটা তার গলায় শুনতে শুনতে বাসার সবার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। সেটা হলো,

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোনে রহিব আপন মনে

ধন নয় মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিল আশা।

মন ভালো থাকলে সে ঘুম থেকে উঠত খুব ভোরে, তারপর বাসার রেডিওটা খুব জোরে বাজাতে শুরু করত। সেটা করেই শেষ নয় এক ঘর থেকে আরেক ঘরে গিয়ে সব বাচ্চাকাচ্চাকে ডাকাডাকি শুরু করত। মন বেশি ভালো থাকলে আরো যে জিনিস করত সেটা খুব বিচিত্র। বাইরে বের হয়ে উঠোনের আনাচে কানাচে থেকে যত শুকনো পাতা, কাগজপত্র জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিত। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলত আর সে মহা আনন্দে আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে থাকত। আগুনপ্রীতি এই মানুষটির সারা জীবন ধরে, আমরা যখন বগুড়া ছিলাম তখন সেখানে ভয়ানক শীত পড়ত। কাজলের বাবা তখন ঘরের ভেতর মেঝেতে ইট বিছিয়ে শুকনো লাকড়ি জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিত। ঘরের ভেতর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, আগুনের ফুলকি ছুটে গিয়ে মশারিতে লেগে কেলেংকারি হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তার কোনো মাথাব্যথা নেই।

এবারের আনন্দটা অবশ্যি ক্ষণস্থায়ী। দেশের আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা। সরকারি চাকরি করে, যখন যে সরকার আসে মুখ বুজে তার কথা মেনে নেবার কথা। কিন্তু একাত্তরের মার্চ মাসে পাকিস্তান সরকারের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। সারা দেশেই তখন চলছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথায়।

পঁচিশে মার্চ গভীর রাতে হঠাৎ মহা শোরগোল। ঘুম ভেঙে উঠে বসেছি সবাই, পাকিস্তান মিলিটারি নাকি ঢাকায় আক্রমণ করেছে। কাজলের বাবা আর তার বড় দুই ছেলে তখনই ছুটে গেল থানায়, সেখানে ওয়ারলেস রয়েছে। ওয়ারলেস ঘিরে সবাই বসেছে, ঢাকা রাজারবাগ থেকে কোনো একজন মানুষ কাঁপা কাঁপা গলায় বলছে, পাকিস্তান মিলিটারি আমাদের আক্রমণ করেছে। প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছে, সাবধান সবাই সাবধান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম যারা অস্ত্র তুলে ধরেছিল তারা ছিল পুলিশ বাহিনী। রক্তক্ষয়ী সেই যুদ্ধে কত অসংখ্য পুলিশ শহীদ হয়েছিল তার নিখুঁত হিসাব কি কোথাও আছে?

ভোর রাতে কাজলের বাবা ফিরে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে।

সে উত্তর না দিয়ে আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

আমি বুঝতে পারলাম একটা মহাবিপদ নেমে আসছে এই দেশের মানুষের ওপর।

দুর্যোগ

এর পরের কয়দিন কেটেছে ভয়াবহ আতঙ্কের মাঝে। পাকিস্তান মিলিটারির অমানুষিক নিষ্ঠুরতার কথা ধীরে ধীরে এসে পৌঁছাতে শুরু করেছে। চারদিকে গুজব, মিলিটারি বাগেরহাটে এসে গেছে, পিরোজপুরে পৌঁছে যাবে যে কোনো মুহূর্তে। আওয়ামী লীগের নেতারা নির্বাচনে জয়ী হয়ে জাতীয় পরিষদে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, হঠাৎ করে নিজেদের আবিষ্কার করলেন একটা অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতিতে। সবাই তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে নেতৃত্বের জন্য। এ রকম পরিবেশে নেতৃত্ব দেবার মতো যোগ্যতা কয়জনের আছে? তখন পিরোজপুরে বেশ সুগঠিত উগ্র বামপন্থী ছাত্রদল ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে তাদের চিন্তা অন্য দশজন থেকে ভিন্ন। বিভিন্ন জায়গা থেকে নানা রকম মানুষ এসে পৌঁছেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাই শেখ নাসের, মেজর জলিল, তারাও কিছুদিন পিরোজপুরে ছিলেন। নানা ধরনের সন্দেহজনক সদস্যরাও এসে হাজির হলো। একজন দাবি করল সে সেনাবাহিনীর লোক, মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করবে, পরদিন সে রাতের অন্ধকারে একজন মানুষকে খুন করে ফেলল, কোনো রাজনৈতিক কারণ নয়, টাকার লোভে। মেজর জলিল তখন পিরোজপুরে। তিনি সেই লোককে মৃত্যুদণ্ড দিলেন, জেলখানায় সাথে সাথেই তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কী করবে সেটা নিয়ে অল্প বিস্তর অনিশ্চয়তা। পুলিশের দায়িত্ব ঠিক কী হবে সেটা নিয়েও কারো কোনো ধারণা নেই। স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাহায্য করার জন্য অস্ত্রাগার খুলে দেয়া হয়েছে। তরুণ ছেলেরা সেই রাইফেল কাঁধে নিয়ে সারা শহর ঘুরে বেড়াচ্ছে। শহরে উত্তেজনা এবং খানিকটা বিশৃঙ্খলা।

কাজলের আব্বা সব দেখেশুনে আমাকে বাচ্চাদের নিয়ে গ্রামের দিকে চলে যেতে বলল। আমি রাজি হই না, আল্লাহর ওপর ভরসা করে সবাই

একসাথে থাকাই আমার ইচ্ছা। সে আমাকে বোঝাল, আমাদের তিন-তিনজন ছেলেমেয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, মিলিটারির অন্ধ রাগ এদের ওপর। হঠাৎ করে মিলিটারি এলে সরে যাবার উপায় থাকবে না। আমি যদি আগে থেকে সরে যাই, সে পরে এসে আমাদের সাথে যোগ দিতে পারবে। তার দায়িত্বে সারা শহর, সে তো সবাইকে ফেলে একা পালিয়ে যেতে পারে না।

অনেক বোঝানোর পর আমি রাজি হলাম। আমি আমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে নাজিরপুর থানায় হাজির হলাম। থানার কাছেই কিছু বাসা তৈরি হয়েছিল, সেখানে আমাদের জায়গা হলো।

সেখানে প্রায় মাসখানেক ছিলাম। দেশের খবর ভালো নয়। সারা দেশ আস্তে আস্তে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতের মুঠোয় চলে আসছে। পিরোজপুরে এখনো মিলিটারি আসেনি। যে কোনো দিন আসবে। শহর ছেড়ে সবাই পালিয়ে যাচ্ছে। একটা ভুতুড়ে পরিবেশ। স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতারাও দেশ ছেড়ে ভারতবর্ষে পালিয়ে গেছেন।

নাজিরপুরে থাকা-খাওয়া নিয়ে অনেক সমস্যা। রান্নার তেল জোগাড় করা যাচ্ছে না, সেদ্ধ খেতে খেতে বাচ্চারা মোটামুটি বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে! একদিন নাজিরপুর থানা থেকে ফোনে কাজলের আব্বার সাথে কথা বলছি, সে খোঁজখবর নিয়ে যখন শুনল এই অবস্থা, খুব বিরক্ত হলো। ওসিকে বলর, এখানে আপনারা স্থানীয় মানুষ যদি আমার পরিবারের দিকে একটু লক্ষ না রাখেন কেমন করে হবে। আমি তো এক টাকা সেরের রসগোল্লা চাইছি না-

এত দুঃখেও আমি না হেসে পারলাম না। এক টাকা সেরের রসগোল্লার গল্প আমি আগেই শুনেছি। কবে পুলিশের এক বড় মহারথী এসেছিলেন, সেখানে কাজলের আব্বা গিয়ে দেখে নাজিরপুর থানার এই ওসি মস্ত হাঁড়িতে করে তার জন্যে রসগোল্লা নিয়ে এসেছে। মহারথী কাজলের আব্বার সামনে মিষ্টির এই প্রকাণ্ড হাঁড়ি নিয়ে একটু লজ্জা পেয়ে গেলেন, তাড়াতাড়ি পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে জিজ্ঞেস করলেন, মিষ্টি কত হয়েছে বলেন দাম দিয়ে দিই।

ওসি হাত কচলে বলল, দাম বেশি হয় নাই স্যার। সস্তায় পেয়ে গেলাম, এক টাকা করে সের!

৫ মে

মে মাসের প্রথম দিকে পিরোজপুরে আলী হায়দার খান একটা ছোট কাগজ নিয়ে হাজির হলো। তাতে কাজলের বাবা এক লাইন লিখেছে, আয়েশা, এই ছেলেটা যা বলবে তাই করবে।

আমরা স্থানীয় মানুষ নই, কেউ আমাদের চেনে না, তাই পিরোজপুরে মিলিটারি পৌঁছানোর পর আমাদের একটা নিরাপদ আশ্রয় দরকার। আলী হায়দার খান আমাদের জন্যে একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। সে আমাদের সবাইকে নিয়ে বাবলা নামক এক গহিন গ্রামে মুবারক খান নামে একজন গ্রাম্য মাতবরের বাসায় পৌঁছে দিল। বিপদের সময় আমাদের সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসা এই তরুণ অ্যাডভোকেট আমাদের পরিবারের সাথে নানাভাবে জড়িত। যুদ্ধের পর তার সাথে আমার বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত একদিন কাজলের বাবা বাবলায় আমাদের কাছে এসে হাজির হলো। তাকে দেখে আমার বুক থেকে একটা পাথর নেমে গেল। মুবারক খাঁয়ের খুশি দেখে কে? স্বয়ং এসডিপিও তার বাসায়! একটু পর পর চা হচ্ছে, যত্ন-আত্তির শেষ নেই। কাজলের আব্বা অবশ্যি খুব চিন্তিত। মিলিটারি আসবে যে কোনো মুহূর্তে। অনেক চিন্তা ভাবনা করে ঠিক করা হয়েছিল যে থানা খালি করে সবাই চলে যাবে।

ভোর দশটার দিকে একজন লোক একটা চিঠি নিয়ে এল। চিঠি লিখেছেন থানার ওসি তফাজ্জল হোসেন। তিনি পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী থানা খালি না করে সেখানে রয়ে গেছেন, কোর্ট ইন্সপেক্টর আলাউদ্দিন এবং সিআই আব্দুল হালিম সাহেবও এসে গেছেন। মিলিটারিরা এসেছে এবং কোনো সমস্যা হয়নি। ওসিও লিখেছেন কাজলের আব্বা যেন অবিলম্বে চলে আসেন। কারণ অন্য সবাইও চলে এসেছে কোনো রকম সমস্যা হবে না।

চিঠিটা আমাদের খুব বিচলিত করে দিল। প্রথমত এখানে গোপনে থাকা হচ্ছে, চিঠি নিয়ে কেউ যদি চলে সেটা গোপন হতে পারে না। আমি বললাম, এখন কী করবে?

কাজলের আব্বা বললেন, যদি না যাই আমার নামে হুলিয়া দিয়ে ধরার জন্যে চলে আসবে। ছেলেমেয়ে সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে। কোথায় পালাব আমরা এতগুলো মানুষ? আমাকে যেতে হবে।

আমি তোমার সাথে যাই।

না তুমি ছেলেমেয়ে নিয়ে থাক।

তাহলে ইকবাল যাক তোমার সাথে।

না না, কী বলছ! বিপদ হতে পারে।

তোমাকে একা যেতে দেব না। আল্লাহর মর্জি কোনো বিপদ হবে না। সবাই আছে।

একটু পরে কাজলের আব্বা ইকবালকে সাথে নিয়ে নৌকা করে রওনা হলো। আমার আল্লাহর ওপর খুব বিশ্বাস। নফল নামাজ পড়ছি, রোজা রাখছি, আল্লাহ তাদের ওপর কোনো বিপদ নামাতে পারে না।

পরদিন বিকেলে ইকবাল একা ফিরে এল, খালি পা, গায়ে একটা ছেঁড়া শার্ট, পরনে লুঙ্গি। গ্রামের মাঝে দিয়ে একজন মাঝিকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে, তাকে এভাবে দেখে আমি আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। নিঃশ্বাস আটকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে ইকবাল?

ইকবাল একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, আব্বা কালকে বিকেলে মিটিংয়ে গিয়েছেন, আর ফিরে আসেননি। সবাই বলছে মিলিটারিরা মেরে ফেলেছে।

আমি আর নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না, হাঁটু ভেঙে বসে পড়লাম।

এক মুহূর্তে আমার জীবনের সবকিছু ওলট পালট হয়ে গেল।

খোঁজখবর

কাল রাত নেমে এল। ছেলেমেয়েরা পাগলের মতো হয়ে গেছে। আমি জায়নামাজে বসে দু হাত তুলে খোদার কাছে কাজলের আব্বার প্রাণ ভিক্ষা করছি। আমার মেজো মেয়ে শিখু অপ্রকৃতিস্থের মতো আমাকে টেনে জায়নামাজ থেকে সরিয়ে ফেলল, চিৎকার করে বলল, আল্লাহ আপনাকে কী দিয়েছে যে আপনি আল্লাহ্‌র কাছে হাত তুলেন?

রাত আর শেষ হয় না, আমি বসে আছি। ভোরের আলো ফুটে উঠতেই আমি একটা নৌকা করে পিরোজপুরে রওনা দিলাম। কী ঝড় বৃষ্টি, ছোট নৌকা প্রবল ঢেউয়ে খোলামকুচির মতো দুলছে, মনে হয় ডুবে যাবে। সাথে ছিল মাঝি ইসমত, বলল, আম্মা নৌকা ভেড়াই?

আমি বললাম, তোমার ভয় করছে?

ইসমত বলল, না আম্মা, আমরা নদীর দেশের মানুষ, আমার ভয় লাগে না। আপনার জন্য বলি।

আমার জন্য তোমার ভেড়াতে হবে না। তুমি যাও। মনে মনে বললাম, খোদা এই নৌকা ডুবিয়ে আমাকে তুমি নিয়ে যাও, আর তো পারি না।

দীর্ঘ সময় লাগল পিরোজপুর পৌঁছাতে। রিকশা করে বাসায় পৌঁছে বুকটা হা হা করে উঠল। যে বিছানায় কাজলের বাবা শুয়েছিল এখনো সেই বিছানায় চাদর এলোমেলো হয়ে আছে। আলনায় কাপড় খুলে রেখেছে, সেই কাপড়ে এখনো তার শরীরের ঘ্রাণ, শুধু মানুষটা নেই। আমি থানায় ফোন করলাম, ফোন ধরল ওসি তফাজ্জল হোসেন। আমার গলার স্বর শুনেই ফোনটা রেখে দিল। এর পর যতবার ফোন করি অন্য একজন ফোন ধরে বলে ওসি নেই। আমি তখন সিআই হালিম সাহেবকে চাইলাম, তিনিও নেই। অনেকবার চেষ্টা করে আমি হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম, ঠিক আছে আমি থানায় আসছি, দেখি কে

কে আছে।

সাথে সাথে সিআই হালিম সাহেব ফোন করলেন, ভাবী আপনি কখন এলেন? বাচ্চারা কোথায়?

আমি তাকে কাজলের আব্বার কথা জিজ্ঞেস করলাম, এসডিপিও সাহেব কোথায়? ঠিক করে বলেন তার কী হয়েছে?

স্যার আছেন। আর্মির ব্যাপার তো, তারা সাথে রেখেছে।

আমি শুনছি আপনি নতুন এসডিপিও হয়েছেন।

কে বলে এসব? বাজে কথা।

ঠিক আছে, আমি মিলিটারির কর্নেল আতিক রশিদের সাথে দেখা করতে চাই, একটা ব্যবস্থা করেন।

শুনে তিনি হা হা করে উঠলেন, বললেন দাঁড়ান আমি আসছি। প্রায় সাথে সাথে তিনি বাসায় এসে হাজির হলেন, বললেন, কর্নেলের সাথে দেখা করলে ব্যাপারটা খুব খারাপ হবে। ওরা হয়তো রেগে যাবে। আপনি খাওয়া-দাওয়া করেন, আমি খাবার পাঠাচ্ছি। বাচ্চাদের রেখে এলেন কেন? কালকেই একটা নৌকা পাঠিয়ে ওদের নিয়ে আসা যাবে। স্যারের কোনো বিপদ হলে আমরা এখানে থাকতাম নাকি? আবার আসব আমি।

তিনি আর আসেননি, ফোন করে জানিয়েছেন যে মিলিটারিরা এখন আমার সাথে দেখা করবে না।

আমি তখন গেলাম প্রাক্তন মুসলিম লীগের মন্ত্রী, বর্তমানে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আফজাল সাহেবের বাসায়। আমাদের বাসার সামনেই তার বাসা, বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। আমাকে দেখে একেবারে হকচকিয়ে গেলেন, আপনি?

জি, আমি জানতে এসেছি এসডিপিও সাহেবের কী হয়েছে?

আপনি ভয় পাবেন না, সব ঠিক আছে।

তাকে কি মেরে ফেলেছে?

না না মারেনি।

তাহলে তিনি কোথায়?

কোথায় তো জানি না। তারপর বিরক্ত হয়ে বললেন, দেশের সত্যি খবরটা তো রাখেন না, শুধু ইন্ডিয়ার রেডিও শোনেন! এখন আপনার বাচ্চাদের নিয়ে দেশে যান। আপনার বাবাকে আমি খবর দিই।

আমার বাবাকে আপনার খবর দিতে হবে না, তিনি নিজেই আসবেন।

আপনার কাছে যেটা জানতে এসেছি সেটা বলেন, এসডিপিও সাহেবকে কি মেরে ফেলেছে?

তিনি বললেন, না মারেনি।

কাজলের আব্বাকে মে মাসের পাঁচ তারিখ বিকেল পাঁচটায় ধলেশ্বরী নদীর তীরে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছিল। সবাই সেটা জানত, আমাকে সামনাসামনি বলার কারো সাহস হয়নি।

দেয়াল ঘড়ি

আমি একা বাসায় আছি। রাতে ঘরদোর গুছিয়ে বসে থাকলাম। সারারাত কারফিউ, গুলি গোলা হতে থাকে। মিলিটারি মানুষজন মারছে। আমি ভাবি হয়তো এর মাঝে কাজলের আব্বা ফিরে আসবে, এসে বলবে, এই তো এসে গেছি, খুব ভয় পেয়েছিলে না?

কিন্তু সে আর আসে না। ভোর হতেই সবাই আমাকে চাপ দেয় চলে যাবার জন্য। আমার বাসার সামনে ডাক্তার সিরাজুল হকের বাসা। মিলিটারি আসার পর থেকে বুকে একটা মস্ত বড় রেডক্রসের চিহ্ন লাগিয়ে হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করছেন। সাহসী মানুষ, সেই মুহূর্তেও গোপনে হাসপাতালে মিলিটারির গুলি খাওয়া মানুষের চিকিৎসা করছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী করি ডাক্তার সাহেব?

পুলিশের সব অফিসার যখন আপনাকে চলে যেতে বলছে আপনি যান।

কিন্তু কাজলের বাবার খবর?

আফজাল সাহেব শান্তি কমিটির মানুষ, তিনি সব জানেন। তিনি যেটা বলেছেন সেটাই নিশ্চয়ই সত্যি।

আমি তখন বাসা ছেড়ে বাচ্চাদের কাছে যাব বলে ঠিক করলাম। আমি নিজ হাতে আবার ঘর পরিষ্কার করে দিলাম। কাজলের বাবা যদি ফিরে আসে তার জন্যে পরিষ্কার কাপড় আলনায় ঝুলিয়ে দিলাম, বিছানায় নতুন চাদর দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে একটা রিকশা নিলাম। রিকশা নৌকা ঘাটে পৌছানোর আগেই মিলিটারি সদলবলে এসে আমার বাসা লুট করে নিল। আমার এতদিনের সংসার, কাজলের আব্বার শত শত বই, তার লেখা অপ্রকাশিত বইয়ের পাণ্ডুলিপি, বাচ্চাদের ছেলেবেলার স্মৃতি সব কিছু তছনছ হয়ে গেল। রাস্তার মানুষকে ডেকে মিলিটারি আদেশ দিল সবকিছু নিয়ে যেতে। একজন বড়

দেয়াল ঘড়িটা নিয়ে যাচ্ছিল, ডাক্তার সিরাজুল হকের সেটা আর সহ্য হলো না। প্রচণ্ড ধমক দিয়ে তার কাছ থেকে কেড়ে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

স্বাধীনতার পর যখন তার সাথে দেখা হলো তিনি আমাদের সেই ঘড়িটা বের করে দিলেন। সেই দেয়াল ঘড়ি এখনো আমার বাসায় দেয়ালে ঝুলছে। অনেকবার ঠিক করার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছি। সেটা দীর্ঘদিন থেকে কাজ করে না। মেজো মেয়ে শিখু মাঝে মাঝে সেটাকে চাবি দিয়ে কীভাবে জানি চালু করে দেয়, ঘণ্টা কয়েক চলে, উল্টোপাল্টা ঘণ্টা বাজায়, তারপর আবার বন্ধ হয়ে যায়, কেউ কিছু মনে করে না! সময় দেখার জন্যেই যে দেয়ালে ঘড়ি রাখতে হবে সেটা কে বলেছে? জীবনের স্মৃতিও তো সেটা দেখাতে পারে!

ঘর ছাড়া

আমি নৌকা করে আবার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বাবলা ফিরে এলাম। বাচ্চারা নিশ্চয়ই কত আশা করে আছে তাদের গিয়ে আমি কী বলব? দূর থেকে দেখি তারা নদীর ঘাটে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরকে বলা হয়েছে এ বাড়িতে তাদের আর আশ্রয় নেই, চলে যেতে হবে।

আমাকে দেখে মুবারক খান এগিয়ে সেই একই কথা বললেন। আমি নরম সুরে বললাম, দেখুন এটা জোয়ার ভাটার দেশ, জোয়ার ভাটার সাথে তাল মিলিয়ে নৌকা যায় আসে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে প্রায়, আজ রাতটা থাকি, কাল ভোরে জোয়ারের সময় চলে যাব।

মুবারক খাঁ মুক্ত শক্ত করে বললেন, না আর এক মুহূর্ত না, আপনি এখনি যান। আমার ছেলেমেয়ে আছে, ঘরবাড়ি আছে, আপনাদের আশ্রয় দিয়ে আমার নিজের সর্বনাশ করতে পারি না।

আমি বড়লোকের মেয়ে নই, বড়লোকের পুত্রবধূ কিংবা স্ত্রীও নই। কিন্তু আমি সম্মানিত পরিবারের মেয়ে, আমি আজীবন মানুষকে সম্মান দিয়ে কথা বলেছি, আজীবন মানুষের কাছে সম্মান পেয়ে এসেছি। এ রকম আচরণে আমার অভ্যাস নেই। আমি আর একটা কথা না বলে একটা ছোট নৌকা ডাকিয়ে তার মাঝে বাচ্চাদের নিয়ে উঠে বসলাম। মুবারক খাঁয়ের বৃদ্ধা বোন, ভ্রাতৃবধু, তার মেয়েরা আমাকে তাদের বাড়িতে রাখার জন্যে এই মানুষটির কাছে কি কাকুতি মিনতি করল তা আর বলার নয়। আমাদের বিচিত্র সমাজ! একজন পুরুষের ইচ্ছের সামনে অসংখ্য মেয়ের ইচ্ছের কোনো মূল্য নেই!

ভর সন্ধ্যেবেলা নৌকা ছেড়েছে কোথায় যাব জানি না। কাজল বলল, আম্মা, ইফতারের সময় হয়ে গেছে, সারা দিন রোজা আছেন, একটু ইফতারি করে নিন।

আমি বললাম, করি বাবা।

তারপর হাত দিয়ে নদী থেকে এক আজলা পানি তুলে খেলাম। সেটাই ইফতার।

সোনার হৃদয়

নৌকা নদীর পানিতে ভেসে যাচ্ছে, কোথায় যাব জানি না। হঠাৎ দেখি নদীর তীরে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ হাত নাড়ছে। নৌকা নদীর তীরে ভেড়ানো হলো, মুবারক খানের বাড়ির প্রাইভেট টিউটর। অল্পবয়স্ক তরুণ, নাম ফজলু। বলল, আপনারা আসেন আমার বাড়িতে ওঠেন।

কোথায় তোমার বাড়ি?

কাছেই, কলাখালী গ্রাম।

আমার বড় বড় ছেলেমেয়ে, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, তার কথা শুনে কেমন যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম, অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই তো? জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বাড়িতে মুরুব্বি কোনো মানুষ আছে? তার সাথে কথা বলতে পারি?

আপনি আগে আসেন তো, তারপর কথা হবে।

রাত্রি বেলা কাদা পানি ভেঙে চাঁদের ম্লান আলোতে গাছপালায় ঢাকা অন্ধকার এক বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। ফজলু একা থাকে, সাথে আর কেউ নেই। আমাদের নামিয়ে দিয়ে সে হঠাৎ রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। সাথে ফজলের আব্বার দুজন মাঝি সর্বক্ষণ রয়েছে। তারা সাধারণ দরিদ্র মানুষ, বিপদের মুখে ফেলে সরে পড়া জাতীয় কাজগুলো জানে না। তাদের বললাম, তোমরা একটু পাহারা দেবে? বিপদ আসতে পারে রাতে।

তারা বলল, আম্মা, ভয় পাবেন না। আমরা আছি।

গভীর রাতে ফজলু ফিরে এল, তার শরীর ভিজে চুপ চুপ করছে, এক হাতে জাল অন্য হাতে মাছের ঝুপড়িতে কিছু মাছ। সে আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করার জন্যে এই রাতে মাছ ধরতে গিয়েছিল।

ভয়াবহ একাত্তরেই আমি আবিষ্কার করেছি যে অসংখ্য সাধারণ মানুষের বুকের ভেতর রয়েছে সোনার হৃদয়। তাদের পায়ের ধূলিতে ধন্য হয়েছে এই পৃথিবী–কার সাধ্যি আছে কলুষিত করবে সেই সোনার পৃথিবী?

আশ্রয়

কলাখালিতে ফজলুর বাড়িতে ভোর হলো। গাছপালায় ঢাকা, দিনের বেলাতেও আলো ঢুকে না এ রকম অন্ধকার। সামনে একটা ছোট পুকুর। আশেপাশে কোনো বাড়িঘর লোকজন নেই। এখানে কী ভরসায় এতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকি? কাজলের বাবা থাকতে প্রথম যেখানে ওঠার কথা ছিল, গুয়ারেখা গ্রামের এক মৌলভী বাড়ি সেখানে একজন মাঝিকে দিয়ে খবর পাঠালাম। মাঝি বিকেলে খবর নিয়ে এল, তাদের আপত্তি নেই, গেলে একটা কিছু ব্যবস্থা হবে। বড় একটা নৌকা জোগাড় করে আবার সবাই রওনা হলাম। সেখানে কোর্ট ইন্সপেক্টর আলাউদ্দিন সাহেবের পরিবার আছেন, আমাদের দেখে খুব বিরক্ত হলেন। আমরা একটা দুষ্ট গ্রহের মতো। আমাদের আশেপাশে যারা আসবে তাদেরও যেন ভয়াবহ দুর্ভাগ্য এসে আলিঙ্গন করবে।

আমরা যেখানে এসেছি সেখানে তিনভাই থাকেন। তিনজনেই অত্যন্ত ধর্মভীরু মানুষ, এই এলাকায় তারা বড় হুজুর, মেজো হুজুর এবং ছোট হুজুর নামে পরিচিত। আমাদের নিয়ে কী করা যায় সেটা নিয়ে শলাপরামর্শ হলো, ঠিক করা হলো বড় হুজুরের শ্বশুরবাড়ি এক গহিন গ্রামে সেখানে আমাদের পাঠিয়ে দেয়া হবে, কেউ তাহলে আর খুঁজে পাবে না। গুয়ারেখা গ্রামটিই এক গহিন গ্রাম এর থেকেও গহিন গ্রামে আমাকে এই বাচ্চাদের নিয়ে তাড়া খাওয়া পশুর মতো পালিয়ে বেড়াতে হবে। চিন্তা করেই কষ্টে আমার বুক ভেঙে গেল, বললাম, আল্লাহর দুনিয়ায় আমার এই বাচ্চাগুলোর জন্যে কি এইটুকু জায়গাও নেই?

আমার কথা শুনে ছোটভাই কারী সাহেব হঠাৎ আমার সামনে এসে হাত জোর করে বললেন, আম্মা, আপনি আমার বাড়িতে এসে থাকেন। আমি আপনাকে মা ডাকছি, আজ থেকে আপনার ছেলেমেয়েরা আমার ভাই বোন। আমি যতদিন আছি আমার ভাইবোনেরা আমার সাথে থাকবে।

আমি আমার মধ্যবয়স্ক এই নতুন সন্তানের বাড়িতে উঠে এলাম। তাঁর দুই বউ। বাড়িতে এসেই তিনি তাদের বললেন, এখন রোজ কেয়ামতের মতো। রোজ কেয়ামতে কেউ পর্দা করবে না, এখনো তোমাদের কোনো পর্দা করতে হবে না।

এই সম্পূর্ণ অপরিচিত ধমভীরু হৃদয়বান মানুষটির বাড়িতে আমরা প্রায় আড়াই মাস ছিলাম। ভদ্রলোক তার কথা রেখেছিলেন, অসংখ্য বিপদের মুখে তিনি আমার বাচ্চাদের নিজের ভাইবোনের মতো করে আগলে রেখেছিলেন। একবার খোঁজ এল গ্রামে মিলিটারি আসছে। ঠিক হলো মেয়েদের পুরানো ময়লা কাপড় পরিয়ে লুকিয়ে রাখা হবে। আমার কাছে পুরানো কাপড় নেই, কারী সাহেবের দুই বউয়ের কাছেও নেই, কাপড় পুরানো হলে কাঁথা বানিয়ে ফেলা হয়।

কারী সাহেব বললেন, আম্মা আপনি ভয় পাবেন না। এ বাড়িতে মিলিটারি আসতে হলে আমাকে মেরে আসতে হবে।

মিলিটারি এ বাড়িতে আসেনি, তাদের দেখে বাড়ির সামনে বৃদ্ধ কিছু মানুষ পাকিস্তানের পতাকা হাতে ঝুলিয়ে চিৎকার করতে থাকল, পাকিস্তান জিন্দাবাদ।

পাশে হিন্দু বাড়ি ছিল, মিলিটারিরা সেগুলো জ্বালিয়ে দিল, যারা সময়মতো পালাতে পারেনি তাদের মেরে ফেলল।

এ সময়ে আরো একটা খুব দুঃখের জিনিস দেখেছি, কাছে ছিল ছরছিনার পীরের মাজার। সেই পীর এই এলাকায় ঘোষণা করেছেন হিন্দুদের সম্পত্তি হচ্ছে গণিমতের সম্পত্তি, মুসলমানদের সেটা ইচ্ছেমতো ভোগ করা জায়েজ আছে। ধর্মের নামে এত বড় অবিচার আমি আগে কখনো দেখিনি। যখন প্রাণভয়ে ভীত দুস্থ হিন্দুদের আমরা কিছু সাহায্য করতে যেতাম সবাই বলত, কেন সাহায্য করছেন? মুসলমানদের সাহায্য করলে পুণ্য হয়, হিন্দুদের করলে তো হয় না।

ধর্মকে এ রকম ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে বের করে আনার আগে এই ধর্মের কাছে আমরা কী চাইতে পারি?

জিন

গুয়ারেখা গ্রামের এই বাড়িতে কিছু বিচিত্র জিনিস ঘটত। সে এলাকায় বাড়ির উপরে ছোট একটি অংশ থাকে, পুরোপুরি দোতলা নয়, মাচার মতো, কিন্তু জানালা রয়েছে তাই আলো বাতাস খেলে। আমরা সেখানে রাতে ঘুমাতাম। একদিন গভীর রাতে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল, আমাদের রেডিওতে হঠাৎ শর্ট ওয়েভে গান বাজতে শুরু করেছে! সবাই লাফিয়ে উঠে বসেছে, ব্যাপারটা কি? কারী সাহেব নিচে থেকে আমাদের হৈ চৈ শুনে অভয় দিলেন, ঐটা কিছু না, জিন! ঘুমান আপনারা!

পরদিন ভোরে তাকে জিন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। ভদ্রলোক বেশ সহজভাবেই জিনের অস্তিত্ব সম্পর্কে কথাবার্তা বললেন। আমার ছেলেমেয়েরা জিনকে দেখতে চাইলে মেজো হুজুর জিনকে দেখানোর ব্যবস্থাও করেছিলেন। সেই জিন অবশ্যি ছিল পাকিস্তানপন্থী এবং ঘোষণা করেছিল পাকিস্তান ভেঙে কখনোই বাংলাদেশ হবে না! সন্দেহাতীতভাবে অলৌকিক জিনিস আমি কখনো দেখিনি। তাই এসব নিয়ে গল্প করা ঠিক নয়, এতে কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেয়া হয়।

এ রকম সময় রাধানগর গ্রাম থেকে আমার সাথে দুজন লোক দেখা করতে এল। তারা দাবি করেছে যে কাজলের বাবার লাশ তারা নদী থেকে তুলে কবর দিয়েছে। আমি তখন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাই না যে সত্যিই সে নেই। তাদের কথা বিশ্বাস করি না। লোকগুলো বলল যে কাজলের বাবার লাশ নদীর ঘাটে এসে লেগেছিল। তারা লাশটাকে আবার নদীতে ভাসিয়ে দিল কিন্তু রাতে আবার ঠিক একই জায়গায় এসে লাশটা লেগে রইল। তখন তাদের মনে হলো এই লাশটি মাটি চাইছে, তাকে মাটি দেয়া দরকার। একজন মৌলভী সাহেবকে ডেকে এনে চারজন মিলে কাজলের বাবাকে নদীতীরে কবর দিল। প্রমাণ হিসেবে তার জুতো জোড়া খুলে রেখেছিল, সাথে সেগুলো নিয়ে এসেছে।

এত বড় প্রমাণ আমি অবিশ্বাস করি কেমন করে, কিন্তু তবুও আমি কেমন করে জানি আশা করে রইলাম যে সব ভুল আর সত্যিই কাজলের বাবা কোথাও বেঁচে আছে। আমার বিশ্বাস আরো বদ্ধমূল হলো যখন সেক্রেটারিয়েট থেকে পাকিস্তান সরকারের একটা কাগজের কপি পাওয়া গেল, যেখানে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতার' অপরাধে আটক অফিসারদের নামের মাঝে কাজলের আব্বার নাম রয়েছে। কে একজন বলল সেক্রেটারিয়েট হচ্ছে দেশের মেরুদণ্ড, সেখান থেকে তো আর ভুল খবর বের হতে পারে না!

গুয়ারেখায় আমার বাবা সুদূর মোহনগঞ্জ থেকে এলেন। তখন দেশে কোনো রকম যোগাযোগ নেই। দীর্ঘ সময় লাগল পৌঁছাতে। সাথে বুদ্ধি করে দুজন মানুষ এনেছেন। স্থানীয় একজন মৌলানা এবং আমানুল্লাহ নামে আমাদের পরিবারের সাথে যুক্ত একজন অত্যন্ত কাজের কিন্তু ভয়াবহ রকম বাক্যবাগীশ মানুষ। মৌলানা সাহেব বিহার থেকে এসেছেন, দীর্ঘদিন এই এলাকায় থেকে বাঙালির মতোই হয়ে গেছেন, তবে উর্দু এখনো ভোলেননি। প্রয়োজনে উর্দুতে কথা বলতে পারেন। তাকে সাথে নিলে রাস্তাঘাটে মিলিটারির হাত থেকে হয়তো উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে।

গুয়ারেখা পৌঁছে বাবা তার নাতি নাতনিকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে ফেললেন। আমি তাকে আমার জীবনে এর আগে কখনো কাঁদতে দেখিনি।

ভয়ানক দুঃসময় তখন। বাবা ঠিক করলেন সবাইকে একবারে নেয়া ঠিক হবে না। প্রথমে সাথে নিলেন আমার ছোট ছেলেমেয়ে দুজন, আমার দুই ভাই এবং ভ্রাতৃবধূ। বিভিন্ন এলাকা থেকে এই দুঃসময়ে আমার ভাই এবং ভ্রাতৃবধূ আমাদের সাথে এসে যোগ দিয়েছে। তারা বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর দীর্ঘদিন পার হয়ে গেল। যোগযোগ নেই, আমি জানিও না সবাই ভালোয় ভালোয় দেশে পৌঁছেছে কি না। বাবার বয়স সত্তর, সেই বয়সে তার থেকেও বৃদ্ধ এই বিহারি মৌলানা সাহেবকে নিয়ে তিনি আবার আমাদের নিতে ফিরে এলেন। এবার যাব আমি, আমার বড় তিন ছেলেমেয়ে এবং সবচেয়ে ছোট মেয়ে। ছেলেদের পরনে লুঙ্গি, মাথায় টুপি, মেয়েদের আপাদমস্তক বোরখায় ঢাকা।

বিদায় নেবার সময় গ্রামের অসংখ্য মানুষ ভিড় করে এল। কারী সাহেব আমার হাত ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করলেন। একসময় লঞ্চ ছেড়ে দিল। কারী সাহেব লঞ্চঘাটে দাঁড়িয়ে রইলেন। লঞ্চ পানি কেটে আমাকে আমার নিজের সন্তানের মতো এই মধ্যবয়স্ক মানুষটি থেকে সরিয়ে নিতে থাকে।

পাগলা বাবা

ঢাকায় পৌঁছে আমার চাচাতো ভাই আবুল হাশিমের বাসায় উঠেছি। আমার কাছে তখন সেক্রেটারিয়েট থেকে বের করা সেই কাগজ, আশায় বুক বেঁধে আছি। কে জানে এই ঢাকা শহরেই হয়তো কোথাও কাজলের বাবাকে আটকে রেখেছে। এর মাঝে একজন আমাকে বলল, মালিবাগে পাগলা বাবার কাছে যাও, বাবা বলে দেবেন সবকিছু। খুব কামেল পীর।

খোঁজখবর করে পাগলা বাবার কাছে গিয়ে দেখি আমার মতো আরো অনেকে। ডিআইপি পত্নী মিসেস মাহমুদ এসপি পত্নী মিসেস হককে আমি নিজেই চিনতে পারলাম– আরো অনেকে আছেন। আমি মনে মনে ঠিক করে গিয়েছিলাম তাকে বেশ কিছু টাকা দেব। পা ছড়িয়ে মহিলা পরিবেষ্টিত হয়ে বসে বসে দামি সিগারেট ফুঁকছেন, সবাই তার পা টিপে যাচ্ছে, দৃশ্যটি জানি কেমন। আমি যত টাকা দেব ভেবেছিলাম তার থেকে কম টাকা বের করে দিলাম, পাগলা বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী নিয়ত করে এসেছিলি বেশি দিবি, কম দিলি কেমন? পাগলা বাবাকে বিশ্বাস নেই?

আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। মিসেস মাহমুদের শাশুড়ি আমাকে বললেন, মা, তুমি দাঁড়িয়ে আছ এখনো? বাবার পায়ে চেপে ধর।

আমি ছুটে গিয়ে বাবার পা চেপে ধরলাম।

পাগলা বাবা আমার কথা শুনে বললেন, স্বামী নিখোঁজ? মানুষ বলছে মেরে ফেলছে?

জি বাবা।

বাবা খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে বললেন, বেঁচে আছে।

বেঁচে আছে? বেঁচে আছে?

হ্যাঁ, ফিরে আসবে। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।

আমি পাগলের মতো তার পা চেপে ধরে থাকি। আশেপাশে যারা ছিল সবাই মাথা নেড়ে বলল, বাবার কথা কখনো ভুল হয় না।

বাইরে ইকবাল আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। পীর ফকিরে তার বিশ্বাস নেই। বের হয়ে আমি তাকে এতবড় সুসংবাদটা দিলাম। সে কিন্তু খুশি হলো না, উল্টো আমাকে বলল, আপনি এইসব বিশ্বাস করবেন না। আব্বা মারা গেছেন, পীর ফকির তাকে বাঁচাতে পারবে না। লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে, আব্বা তাদের মাঝে একজন। সত্যিটা স্বীকার করে নেন। না হয় একদিন হার্টফেল করে মারা যাবেন, তখন আমাদের কী হবে?

আমি ভাবলাম তাকে নিয়ে যাই বাবার কাছে, তাহলে বুঝবে কত বড় পীর, আর উল্টাপাল্টা কথা বলবে না। ভেতরে গিয়ে দেখি এখন বাবার কাছে পুরুষ মানুষের ভিড়, মেয়েদের যাওয়া নিষেধ। আমি আর যেতে পারলাম না।

পাগলা বাবার কাছে আমার মতো আরো একজন যেত, সম্পর্কে আমার বোন, নাম মজিদা। তার স্বামী মেজর আনোয়ার কুমিল্লাতে ছিলেন। কাজলের বাবার মতো সেও নিখোঁজ। মজিদার ভক্তি আমার থেকে অনেক বেশি। পাগলা বাবার জন্যে দুবেলা রান্না করে নিয়ে যেত। দেশ স্বাধীন হবার পর যখন মেজর আনোয়ার ফিরে এলেন না পাগলা বাবা মজিদাকে বললেন, ধরে পাকিস্তান নিয়ে গেছে, এ জন্যে আসতে দেরি হচ্ছে। মজিদা শুনে তার গলার হার খুলে সাথে সাথে বাবার হাতে ধরিয়ে দিল।

ময়নামতিতে এক গণকবরে অন্যান্য অনেকের সাথে মেজর আনোয়ারের দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল। আমি জানি না মজিদা তারপর পাগলা বাবার সাথে দেখা করেছিল কি না।

ধর্মের নামে মানুষের দুঃখ-কষ্টকে পুঁজি করে যারা ব্যবসা করে খোদা কি তাদের ক্ষমা করবেন?

মোহনগঞ্জ

বাবার বাড়ি মোহনগঞ্জ পৌঁছেই আমরা একটা অত্যন্ত খারাপ খবর পেলাম। আমাদের বাড়ির কাছেই মোহনগঞ্জ থানা, সেখানে পাকিস্তান মিলিটারি এসে ঘাঁটি তৈরি করেছে। থানার চারদিকে গাছপালা কেটে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে, থানা কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা, বালুর বস্তা দিয়ে বাংকার তৈরি হয়েছে। খারাপ খবর সেটি নয়, খারাপ খবরটি হচ্ছে বাবা যখন আমাদের আনতে গিয়েছেন তখন মিলিটারিরা তাকে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান তৈরি করে দিয়েছে। বাবা ছিলেন না বলে প্রথমে আরেকজনকে তৈরি করেছিল। সে এলাকা ছেড়ে সপরিবারে পালিয়ে গেছে। এখন বাবা হচ্ছেন শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান, মিলিটারির হুকুম তিনি এলেই যেন দেখা করতে যান।

বাবা খুব মুষড়ে পড়লেন। মিলিটারি এসেই এই এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব শুরু করেছে, একেবারে বাড়ির পাশে এসে গুলি করে মানুষ মেরে পুকুরে ভাসিয়ে দিয়েছে। দিন দুপুরে মেয়েদের ওপর অত্যাচার। মানুষজনের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া, গরু বাছুর ধরে খাওয়ার কথা তো ছেড়েই দিলাম। বাবা বারান্দায় জলচৌকিতে বসে দীর্ঘ সময় ভাবলেন। তার এমনিতে এত বড় পরিবার, তার ওপর শহর থেকে পালিয়ে ছেলেরা তাদের বউ-বাচ্চা নিয়ে এসেছে। এখন আমিও আমার ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছি, সবাইকে নিয়ে পালিয়ে যাবেন কোথায়, সবাই তো পালিয়ে তার কাছেই এল! পালিয়ে যদি না যান তিনি কী করবেন? মিলিটারিকে বলবেন তিনি এই দায়িত্ব চান না? কী কৈফিয়ত দেবেন?

বাবা কোনো কৈফিয়ত দিতে পারেননি, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সেই ভয়াবহ অশুভ শক্তির সামনে পরাভূত হয়ে তাকে শান্তি কমিটির দায়িত্ব নিতে হলো।

সেই অপরাধে ডিসেম্বর মাসের আট তারিখ মুক্তিযোদ্ধার একটি দলের

হাতে আমার বাবা এবং তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী আমার ছোট ভাই নজরুল মারা যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই সময়টি বড় নিষ্করুণ সময়!

আমার দুঃখ হয় এই ভেবে যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুরতার কথা সত্যিকারভাবে যদি একজন মানুষ জানত সেটি হচ্ছে আমার বাবা। সেনাবাহিনী স্থানীয় মানুষজন থেকে পুরোপুরিভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকত। মোহনগঞ্জ থানায় তারকাটা ঘেরা, বালুর বস্তার বাংকারের আড়ালে ছিল তাদের নিরাপদ আশ্রয়। আমরা যখন মোহনগঞ্জ তখন একরাতে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা এসে মোহনগঞ্জ থানা আক্রমণ করেছিল। সারা রাতব্যাপী কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ! পাকিস্তান সেনাবাহিনী জানত এ দেশের মানুষ তাদের ঘেন্না করে, তারা জানত এ দেশের মানুষ স্বাধীনতার সপক্ষে, সবাই কমবেশি মুক্তিযোদ্ধা। কেউ হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে, কেউ নেয়নি এই পার্থক্য। তাই তারা তাদের নিরাপদ আশ্রয় থেকে বের হতো না। যখন লুটপাট কিংবা হত্যাকাণ্ডের জন্য বের হতো তখন দলবেঁধে থাকত। সেনাবাহিনীর এই দলগুলো এখানে পাকাপাকিভাবে থাকত না, কিছুদিন পর পর একদল গিয়ে অন্য আরেক দল আসত, নতুন দল এসে নতুন করে শুরু করত অত্যাচার। মানুষজন থেকে পুরোপুরিভাবে বিচ্ছিন্ন এই সেনাবাহিনী এত ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল যে তারা আসছে খবর পেয়ে আমার এক দূর সম্পর্কের এক বোনের শ্বশুর আতঙ্কে চিৎকার করতে করতেই মারা গিয়েছিলেন।

বড় শহরে লোক দেখানো স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করা, পাকিস্তানের স্বপক্ষে জনমত তৈরি করার যে চেষ্টা ছিল, মফস্বলের এই এলাকায় তার কোনো চিহ্ন ছিল না। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আমার বাবার দায়িত্ব ছিল অত্যন্ত সরল, সেনাবাহিনীর লোকেরা যাকে এখনো মেরে ফেলেনি, তার প্রাণ ভিক্ষা করা।

অসংখ্য মানুষকে বাবা প্রাণে বাঁচাতে পেরেছিলেন। মফিজ নামে একজনকে নদীর পানিতে নামিয়েছে গুলি করার জন্য, রমজান মাসের সন্ধ্যে, ইফতারের সময়, বাবা ছুটে গিয়ে আক্ষরিক অর্থে তাদের রাইফেলের নল ধরে তাদের নিবৃত্ত করলেন। মফিজকে বাড়িতে আনা হলো, ভাত খাওয়ানো হলো। সে খেয়ে বাবাকে বলল, আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, কালকেই আমি আলবদরে যোগ দেব।

উপস্থিত সবাই বলল, তোমার মাথা খারাপ? আলবদরে যাবে? কোথাও যদি যোগ দিতে চাও তাহলে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দাও।

মফিজ গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিল।

লালচান নামে একজনকে ধরে নিয়ে তার ওপর এমন অত্যাচার করা হলো যে তার বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে গেছে, কাউকে চিনতে পারে না, কথা বলতে পারে না। বাবা নিজে মুচলেখা দিয়ে তাকে ছুটিয়ে আনলেন।

একবার অস্ত্রসহ একজন মুক্তিযোদ্ধা ধরা পড়ল। খবর আনল আমানুল্লাহ ভয়ঙ্কর অত্যাচার করা হচ্ছে তার ওপর। বাবা খবর পেয়ে সাথে সাথেই গেলেন, তাকে গুলি করার আয়োজন করা হচ্ছে। মিলিটারিকে বললেন, ছেলেটা তো তোমাদের হাতেই আছে, মারতে যদি চাও যখন খুশি মারতে পারবে। এখন একটু সুস্থ হতে দাও। রাতে আবার তাকে দেখতে গেলেন, ওষুধপত্র দিলেন। তাকে সুস্থ করা হলো, তার বাবা একদিন এসে তাকে দেখে গলা। দীর্ঘদিন থানায় আটক থেকে সে শেষ পর্যন্ত প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল।

অসংখ্য মানুষকে বাবা প্রাণে রক্ষা করেছিলেন, সেনাবাহিনীর কাছে গিয়ে তাদের প্রাণ ভিক্ষা করতে গিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রকৃত রূপ তিনি যেভাবে দেখেছিলেন, আর কেউ সেটা দেখেনি। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতি তার যে রকম ঘৃণা ছিল আর কারো সম্ভবত সে রকম ছিল না।

স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করেছিল তার গা ঢাকা দিল। বাবা গা ঢাকা দিলেন না, তিনি তাদের সাথে কোনো সহযোগিতা করেননি, তিনি অসংখ্য মানুষকে প্রাণে বাঁচিয়ে এনেছেন, যাদের তিনি প্রাণে বাঁচিয়েছেন তাদের কেউ কেউ মুক্তিবাহিনীতেও যোগ দিয়েছে, তিনি কেন গা ঢাকা দেবেন?

কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পৈশাচিক অত্যাচারের প্রতিশোধের আগুন তবুও তাকে স্পর্শ করেছিল।

আমার বাবা স্বেচ্ছায় শান্তিবাহিনীতে যোগ দেননি, আমাদের সবাইকে নিয়ে পালিয়ে যাবার তার কোনো জায়গা ছিল না, তাই সেনাবাহিনীর অশুভ শক্তির সামনে তাকে সেই কলঙ্কের টীকা পরে থাকতে হয়েছিল। তিনি সেনাবাহিনীর সাথে কোনো সহযোগিতা করেননি, বরং অসংখ্য মানুষকে তিনি প্রাণে রক্ষা করেছেন। আমি তাকে কাছে থেকে দেখেছি। তাই জানি যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্যে তার মনে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু ছিল না। তাই শুধু আমার বাবার জন্যে রয়েছে আমার বুকভরা ভালোবাসা।

কিন্তু যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিল তাদের আর কারো জন্যে আমার কোনো ভালোবাসা নেই।

স্বাধীনতা

ডিসেম্বরের ষোল তারিখ দেশ স্বাধীন হলো। তখন কাজল আর ইকবাল ঢাকায়। দীর্ঘদিন তাদের সাথে যোগাযোগ নেই। প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে। কে জানে তারা কোথায় আছে, কেমন আছে। পুরো দেশে রাস্তাঘাট নেই, বাস ট্রেন চলে না তাদের কোনো খোঁজ জানি না। দীর্ঘদিন পর তারা পায়ে হেঁটে একদিন মোহনগঞ্জ হাজির হলো।

যুদ্ধের সময় ঢাকা শহরে লুকিয়ে লুকিয়ে সময় কাটিয়েছে। ঢাকায় তখন তাদের খোঁজখবর রাখতেন আনিসুর রহমান ঠাকুর, আমাদের এক মামা। বিপদের সময় আমাদের এত বড় সহায় ঢাকা শহরে আর কেউ ছিল না। এর মাঝে কাজলকে একবার মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, প্রচণ্ড দৈহিক অত্যাচার করেছে কিন্তু প্রাণে মারেনি। আমি খোদার কাছে শুকুর করলাম লক্ষ বার।

দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমাদের নতুন জীবন শুরু হবে এখন।

অবুঝ মেয়ে

স্বাধীনতার পর ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে আমি ইকবাল, ছোট মেয়ে মনি আর সর্বকর্মা বাক্যবাগীশ আমানুল্লাহকে নিয়ে পিরোজপুর রওনা দিলাম। ততদিনে আমি মোটামুটি স্বীকার করে নিয়েছি যে কাজলের বাবা নেই। তাকে যেখানে কবর দেয়া হয়েছে সেখানে যাওয়ার ইচ্ছে। সত্যিই কি তাকে কবর দেয়া হয়েছে? ইকবালকে জিজ্ঞেস করে দেখলাম সে কি কবরটা খুঁড়ে দেখতে পারবে কি না, সত্যিই তার বাবার দেহাবশেষ আছে কি না। ইকবাল প্রকট অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল সে পারবে।

মনি তখন অনেক ছোট, তাকে তখনো বলা হয়নি তার আব্বা আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। সেটা এখনই করতে হবে। ইকবালকেই করতে হবে। মনির সাথে তার খুব ভাব, ইকবাল তাকে খুব ভালো বোঝে। খুব কমিক দেখতে পছন্দ করে, তাই দোকান থেকে কয়েকটা কমিক কিনে এনেছে। লঞ্চঘাটে এসে মনিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, মনি, শোন তোমাকে একটা জিনিস বলি। আব্বা কিন্তু মারা গেছেন।

মনি কথা বলতে পারে না, ঠোঁট দেখে কথা বুঝতে হয়। কথাটি বুঝতে পেরে চিৎকার করে উঠল, তারপর ইকবালের দিকে তাকিয়ে অনেক আশা করে তার নিজের ভাষায় জিজ্ঞেস করল, তুমি মিছি মিছি বলছ তাই না?

ইকবাল মাথা নেড়ে বলল, না, সত্যি বলছি।

ছোট বোন আকুল হয়ে কাঁদছে, ভাই নিজের চোখের পানি আটকানোর চেষ্টা করতে করতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হেঁটে হেঁটে লঞ্চে উঠছে, আমার সমস্ত হৃদয় হা হা করে উঠল। হায় খোদা, তুমি পৃথিবীতে মানুষের জন্যে না জানি কত দুঃখ সঞ্চয় করে রেখেছ।

সারা রাত লঞ্চ যাবে, ভোরে পৌঁছাবে হুলারহাট, সেখান থেকে পিরোজপুর। সারা রাত আমার অবুঝ মেয়েটি জেগে রইল, একটু পর পর হু হু করে কাঁদছে। ইকবাল তাকে জড়িয়ে ধরে কমিকটি খুলে ধরে তাকে দেখাচ্ছে, কিন্তু তার আর কিছুতে উৎসাহ নেই।

দেহাবশেষ

পিরোজপুরে পৌঁছানোর পর সবাই আমার সাথে দেখা করতে এল। যারা একসময় আমার থেকে শতহস্ত দূরে থেকেছে তারাও। বাবলা গ্রামে ভর সন্ধ্যেবেলা বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল যে মুবারক খান তিনিও এসেছেন। হাত জোড় করে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, মা, আপনার কাছে আমি হাত জোড় করে ক্ষমা চাই, আপনি আমায় ক্ষমা করে দেন। ছেলে পিলের বাবা আমি–

আমি আমি ডাক্তার সাহেবের বাসায় উঠেছি। নির্জন নদীতীরে যেখানে কাজলের বাবাকে কবর দেয়া হয়েছে সেখান থেকে তাকে তুলে আমি দেশে নিয়ে যেতে যেতে চাই, সেটাও সবাইকে বললাম। স্থানীয় লোকজন আছে, মুক্তিযোদ্ধারা আছে সবাই বলল, স্যার আমাদের এখানকার প্রথম শহীদ, তাকে নেবেন না, এখানকার মাটিতেই রেখে যান।

ইকবালও বলল রাস্তাঘাট নেই, এর মাঝে একটা কফিনে তার দেহাবশেষ নিয়ে দেশের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় নেয়া সহজ ব্যাপার নয়। সবাই যখন চাইছে তাকে এখানেই রেখে যান। নির্জন নদীতীর থেকে তুলে এনে এখানকার কবরস্থানে কবর দিয়ে দিই।

আমি রাজি হলাম।

সবাই মিলে তখন আরেকটি প্রস্তাব দিল। এ দেশে পাকিস্তান মিলিটারির লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরেছে, কিন্তু হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা যায় সে রকম সাক্ষী প্রমাণ কারো বিরুদ্ধে নেই। কাজলের বাবার হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী প্রমাণ রয়েছে, কে মেরেছে কারা মেরেছে কীভাবে মেরেছে তাও জানা আছে। শুধু তাই নয়, সে অত্যন্ত অল্প কিছু সৌভাগ্যবানের (!) একজন যার মৃতদেহ শকুনী গৃধিনী ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়নি, যাকে মানুষেরা তুলে এনে দাফন করেছে।

তার দেহাবশেষ বের করে ময়নাতদন্ত করা যাবে এবং হত্যাকারী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ খুনের মামলা দাঁড় করানো যাবে। খুনি আসামির প্রধান নায়ক ব্রিগেডিয়ার আতিক রশীদ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ধরা পড়েছে। এখন যুদ্ধবন্দি হিসেবে আছে, সাধারণ যুদ্ধবন্দিরা মুক্তি পেয়ে শেষ পর্যন্ত দেশে যেতে পারে, কিন্তু যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তাকে বিচার করা হত্যাকারীর শাস্তি দেয়া যাবে।

সবাই মিলে আমরা নদীতীরে এক নির্জন জায়গায় হাজির হলাম। ইকবাল আমাকে দূরে বসিয়ে দিয়ে গেল। সে নিজেই আমানুল্লাহকে নিয়ে তার বাবার কবর খুঁড়ে দেহাবশেষ বের করেছিল। এই দীর্ঘদিন পরেও তার বাবার পায়ে নাকি ছিল একজোড়া অবিকৃত নাইলনের মোজা। ডাক্তার সাহেব ছিলেন, তিনি ময়নাতদন্ত করলেন। বেশ কয়েকটি গুলি লেগেছিল, একটি পায়ে, একটি বুকে, একটি মাথায়। যেটি মাথায় লেগেছিল সেটিই সম্ভবত তার প্রাণ নিয়েছে। তাকে তার ছেলে আবার যত্ন করে কফিনে তুলে দিল। তারপর আমাকে এসে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে ফেলল।

আমি প্রথমবার সত্যি সত্যি জানলাম কাজলের বাবা আর নেই।

জানাজা

কফিন নৌকায় তুলে শহরে আনা হলো। ইকবাল আমাকে সেটা খুলে দেখতে দেয়নি। আমার এত রূপবান স্বামীকে এভাবে নাকি দেখতে নেই। আমি কফিনটা জড়িয়ে বসে রইলাম, এ জীবনে এর থেকে বেশি কাছে আর আমি কোনোদিন যেতে পারব না।

সে রাতের জন্য কফিনটা থানাতে থাকবে। আমি দুজন ধর্মপ্রাণ মানুষ জোগাড় করলাম যারা রাত জেগে তার পাশে কোরান শরীফ পড়বে।

যখন কফিনটা আনা হয়েছে ঠিক তখন আফজাল সাহেবকেও গ্রেপ্তার করে থানায় আনা হয়েছে, আমি তার কাছে একাধিক কাজলের বাবার কথা জানতে চেয়েছিলাম, উত্তর না দিয়ে দেশ সম্পর্কে আমাকে জ্ঞানদান করেছিলেন। আমাকে দেখে তিনি শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, চিনতে পারলেন সে রকম ভাব করলেন না।

পরদিন কাজলের বাবার জানাজা হলো, হাজার হাজার মানুষ এসে সেই জানাজায় যোগ দিল। জানাজার পর কাফনের কাপড়ে জড়ানো তার দেহাবশেষ নিয়ে যাওয়া হলো কবরস্থানে। কবর খুঁড়ে রাখা হয়েছে। ইকবাল হাতে ধরে শুইয়ে দিল তাকে কবরে। আমার মনে পড়ল ইকবালের জন্মের কথা, জন্মের পরপরই কাদম্বিনী নার্স তাকে মুছে তুলে দিয়েছিল তার বাবার হাতে, হাতে নিয়ে ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে উঠেছিল মানুষটি। আজ সেই ইকবাল তার বাবাকে কোলে করে শুইয়ে দিল কবরে।

যতদিন ছিলাম প্রতিদিন ভোরে কবরস্থানে যেতাম। মাথার কাছে বসে কোরান শরীফ পড়তাম। একদিন বের হয়েছি, রিকশা নেব। খালি একটা রিকশায় উঠে কোথায় যাব বলার আগেই সে বলল, আমি জানি আপনি কোথায় যাবেন আম্মা।

কবরস্থানে নামিয়ে বলল, আপনি ভেতরে যান আম্মা। আমি বাইরে অপেক্ষা করছি, আপনাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

আমি বললাম, আমার জন্য তোমার অপেক্ষা করতে হবে না বাবা। তুমি যাও।

সে বলল, না আম্মা। আপনাদের জন্যে এইটুকু করি।

আমি আর আপত্তি করলাম না। মানুষের ভালোবাসা তো হাত ঠেলে সরিয়ে দিতে পারি না। তাহলে জীবনে থাকবেটা কী?

অনেক যত্ন করে খুনের কেসটা দাঁড় করানো হয়েছিল। যারা দেখেছে তাদের সাক্ষী প্রমাণ। যারা কবর দিয়েছে তাদের সাক্ষী প্রমাণ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সবকিছু। প্রধান আসামি ব্রিগেডিয়ার আতিক রশীদ। সাথে মেজর এজাজ।

দীর্ঘ সময় নিয়ে তৈরি করে সেই কেস ফাইল করা হলো।

আমি ঢাকা ফিরে এলাম। ছেলেমেয়েকে বললাম যে যুদ্ধাপরাধীর বিচার হবে, তাদের বাবাকে যারা হত্যা করেছে তাদের এ দেশের মাটিতে বিচার করা হবে। ন্যুরেমবার্গের বিচারের মতো হবে সেই বিচার। এই স্বাধীন দেশের মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে সেই হত্যাকারী খুনিদের। বলতে হবে কেন বিনা বিচারে হত্যা করেছে এই মানুষদের। পৃথিবীর সব মানুষ জানবে কী নৃশংস অত্যাচারে এ দেশের মানুষ জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে।

আমি অপেক্ষা করে আছি, আমার ছেলেমেয়েরা অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু সেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হলো না। এ দেশের তিরিশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে পাকিস্তানের নব্বই হাজার সৈন্য সসম্মানে তাদের দেশে ফিরে গেল। এ দেশের সরকার একটি বার তার বিচারের কথা উচ্চারণ পর্যন্ত করল না। তিরিশ লক্ষ প্রাণের প্রতি অবমাননার এর থেকে বড় উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটিও নেই। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারকে আমি কখনো সে জন্যে ক্ষমা করিনি।

এরপর প্রত্যেকবার নতুন সরকার আসার পর আমি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে আবেদন করে বলেছি, পাকিস্তান সরকারের কাছে আমার স্বামীর হত্যাকারীকে ফেরত চেয়ে এ দেশের মাটিতে তার বিচার করা হোক। তিরিশ লক্ষ প্রাণের প্রতি যে অবমাননা দেখানো হয়েছে সেই অবমাননার অবসান করা হোক। কোনো লাভ হয়নি।

এখন দেশে আবার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নতুন সরকার এসেছে। আমি আবার প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছে আমার স্বামীর হত্যাকারীর বিচার চাইব। আমার বক্তব্য অত্যন্ত সরল, আমি বাহাত্তর সনে একটি হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে পিরোজপুর থানায় কেস ফাইল করেছি, স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমি সেই বিচার আশা করতে পারি। এ দেশের কোর্টে হত্যাকারীর বিচার করা হোক। পাকিস্তান সরকারের কাছে সেই হত্যাকারীকে ফেরত চাওয়া হোক। একটি দেশকে তার দেশের তিরিশ লক্ষ প্রাণের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যে আনুষ্ঠানিকভাবে হলেও সেই হত্যাকারীর বিচার করতে হবে। করতেই হবে।

যদি এ সরকারের কাছে বিচার না পাই, পরের সরকারের কাছে আবার এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে যাব। যদি না পাই তাহলে এর পরের সরকারের কাছে বিচার চাইব। না হলে এর পরের সরকারের কাছে। হয়তো একদিন সরকার আসবে যে সরকার সারা পৃথিবীর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বলবে, সত্যিই তো একটা নৃশংস জাতি ঠাণ্ডা মাথায় এ দেশের তিরিশ লক্ষ মানুষকে খুন করে যাবে, আর সেই খুনিদের বিচার করার কথা উচ্চারণ পর্যন্ত করব না, আমরা কি এত বড় মেরুদণ্ডহীন জাতি?

নিশ্চয় আসবে।

নিশ্চয়ই আসবে।

আফজাল

পিরোজপুর থেকে ফিরে এসে আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঢাকায় আশ্রয় নিয়েছি। বড় মেয়ে শেফুর বিয়ে দিয়ে পুরানা পল্টনে একটা বাসা নিয়েছি। তখন একদিন আফজাল এসে হাজির।

যখন কুমিল্লা ছিলাম আফজাল আমাদের বাসায় কাজ করত। সহজ-সরল ছেলেমানুষ। সন্ধ্যের পর কাজকর্ম শেষ করে বারান্দায় বসে তার একটু গল্প করার শখ ছিল। গল্পগুলো হতো এ রকম।

বুঝলেন আম্মা, দাদার বিয়ের সময় একটু খরচপাতি করা দরকার।

দাদা বলতে সে বোঝাচ্ছে কাজলকে, সে তখন ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী রকম খরচ পাতি?

একটু ভালো রকম। আমোদ স্ফুর্তির একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার।

কী রকম আমোদ স্ফুর্তি।

এই পর্যায়ে আফজাল কল্পনায় ডুবে দিত, চোখ অর্ধেক বন্ধ করে সে বলত, দুইটা মলি বাঁশ পুঁততে হবে আগে। বাঁশের আগায় থাকবে কপিকল। নিচে থাকবে চেয়ার। এক চেয়ারে বসবে দাদা আরেক চেয়ারে বসবে ভাবী। দাদারে দড়ি দিয়ে টেনে বাঁশের আগায় তুলে রাখতে হবে আগে। তারপর অনেক রকম বাজি বারুদ ফুটবে, তখন ভাবীর চেয়ারটাকে টেনে উপরে তোলা শুরু হবে। তারপর আরো বাজি বারুদ ফুটবে তখন দাদা নামবে নিচে, যখন দুইজনই মাঝখানে আসবে তখন একজন আরেকজনের হাতে হ্যান্ডশেক করবে। তখন আরো বাজি বারুদ ফুটবে।

আমাদের পক্ষে হাসি আটকে রাখা কঠিন ব্যাপার ছিল। কাজলের সৌভাগ্য তার বিয়ের সময় আফজাল মলি বাঁশ এবং কপিকল নিয়ে হাজির হয়নি!

স্বাধীনতা সংগ্রামের পর সে খোঁজ পেল যে কাজলের বাবা মারা গেছে।

আমরা ঢাকায় আছি কাজল, শেফু এবং ইকবাল ইউনিভার্সিটিতে পড়ে শুধু এটুকু খবরের ওপর ভরসা করে সে ঢাকা এসে হাজির হলো। ইউনিভার্সিটির হলগুলোর বারান্দায় বারান্দায় উচ্চস্বরে দাদা এবং ইকবাল ভাই বলে ডেকে ডেকে সে শেষ পর্যন্ত আমাদের ঠিকানা জোগাড় করে ফেলল। আমি এক সন্ধ্যায় মাগরেবের নামাজ শেষ করে দেখি সে আমার পাশে বসে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে।

আমি বললাম, আরে আফজাল! তুই কোথা থেকে।

স্যারকে পাঞ্জাবিরা মেরে ফেলছে গো আম্মা।

আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম। সে একটু শান্ত হয়ে বলল, আম্মা, বড় আপাকে বিয়ে দিয়েছেন?

হ্যাঁ।

জামাইয়ের বাড়ি বরিশালে শুনে সে কপালে করাঘাত করল, কী সর্বনাশ করলেন গো আম্মা! ডাকাইতের দেশে বিয়ে দিয়ে দিলেন!

আমার আবার হাসি গোপন করতে হলো।

আফজালকে চেনা যায় না। পরনে ফুলপ্যান্ট, গায়ে খাকি সোয়েটার, পায়ে মুক্তিবাহিনীর জুতা। সে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করে ফিরে এসেছে। দেখে বড় ভালো লাগল আমার। আমি গায়ে হাত বুলিয়ে বললাম, বাবা, তোরাই তো দেশ স্বাধীন করলি।

হ্যাঁ আম্মা। আর ভয় নাই।

তোরা থাকতে আর ভয় কি?

অনেক বড় বড় মানুষের সাথে আমার জানাশোনা। আপনি খালি বলেন কী লাগবে।

আফজাল ঘণ্টাখানেকের মাঝে গুছিয়ে বসল। ফুলপ্যান্ট খুলে ধুয়ে নেড়ে দিল। আমাকে এসে বলল, আম্মা, আপনি সংসারের দায়িত্ব নিতে পারবেন না। আমার ওপর ছেড়ে দেন।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে দায়িত্ব নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেল।

প্রথমেই সে খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর দিল। খাওয়া-দাওয়ায় নাকি অহেতুক পয়সা খরচ হচ্ছে। পয়সা বাঁচানোর জন্য সে নিজে বাজার করে এনে রান্না করে নিজেই ছেলেমেয়েদের খাওয়ায়। প্লেটে ছোট এক টুকরা মাংস দিয়ে চামচে আরেকটা নিয়ে বলে, আর কি লাগবে ভাই? লাগবে কি?

ছেলেমেয়েরা আফজালের মনে আঘাত দিতে চায় না, বলে না আর লাগবে না!

আফজালের মুখে হাসি ফুটে উঠে। এক বেলার খাবার সে তিন বেলা চালিয়ে দেয়।

আমি দেখলাম অবস্থা বেগতিক। আফজালকে বললাম, তুই এখন রান্নাঘরে কী করিস? যুদ্ধ টুদ্ধ করে এসেছিস, ভালো কোনো কাজ কর। সে বলল, ঠিক বলেছেন আম্মা। খন্দকার মুশতাক বলেছেন আমাদের ডাকবেন। তখন যেতে হবে।

ঠিক তখন হঠাৎ করে পুলিশ মিলিটারি বাসায় বাসায় ঘেরাও করে খানা তাল্লাশি করছে। একদিন আমার বাসাতেও এসে হাজির। আমার বাসায় কিছু নেই, তাদের কিছু পাওয়ার কথা না। তবু তারা একটা জিনিস পেয়ে গেল সেটা হচ্ছে আমার জামাইয়ের পাগড়ি। নতুন বিয়ে হয়েছে চকচকে সুদৃশ্য পাগড়ি। হাতে নিয়ে পুলিশ বলল, এই তো লুটের মালা। বিহারির বাড়ি লুট করে আনা হয়েছে।

আমি চেষ্টা করে মেজাজ ঠিক রেখে বললাম, এটি আমার জামাইয়ের পাগড়ি।

যারা এসেছে তারা আমার কথা শুনতে রাজি না, হম্বি তম্বি করতে থাকে। এর মাঝে আফজাল ঘুম থেকে উঠে আসে। ব্যাপারটা বুঝতে তার একটু সময় লাগল, যখন বুঝতে পারল, হঠাৎ সে বোমার মতো ফেটে পড়ল, কি? এত বড় সাহস? আমার স্যারের বাসায় তোমরা লুটের মাল খোঁজ? স্যারকে পাঞ্জাবিরা মেরে ফেলেছে, আর সেই স্যারের বাসায় থাকবে লুটের মাল?

পুলিশ হকচকিয়ে যায়, বলে, তুমি কে?

আমি? আফজাল হুঙ্কার দিয়ে বলে, আমি মুক্তিবাহিনী!

পুলিশ আর একটা কথা না বলে সুড়সুড় করে বের হয়ে গেল।

আফজালের কাছে কয়দিন পর তার বয়সী অনেক ছেলের আনাগোনা শুরু হলো। শুনলাম খন্দকার মুশতাক আহমেদ তাদের ডাকছেন। আমি, বললাম, তুই যা। হয়তো তোদের বড় চাকরি দেবেন। ভালো চাকরি নিয়ে বিয়ে করে সংসারী হ। তোর মা নিশ্চয় এখন একটা বউ দেখতে চান!

আফজাল এক গাল হেসে ফেলল। তারপর একদিন বিদায় নিল।

নিজের অজান্তে আমি এখনো মাঝে মাঝে তার জন্য অপেক্ষা করি। কোথায় আছে সে কে জানে?

শহীদ পরিবার

ঢাকা এসে প্রথমে দেখা করেছিলাম পুলিশের আইজি খালেক সাহেবের সাথে, তিনি বগুড়ায় এসপি ছিলেন। তখন থেকে পরিচয়। আমার সাথে দীর্ঘ সময় কাজলের বাবার ভাগ্য নিয়ে দুঃখ করলেন। বললেন, আপনার যে রকম ক্ষতি হয়েছে আমাদেরও সে রকম ক্ষতি হয়েছে! পুলিশ ডিপার্টমেন্টে এই মানুষটি ছিল একটা ফুলের মতো।

ছেলেমেয়েদের খোঁজ নিয়ে বললেন, আপনার বড় ছেলে কত বড়? তাকে নিয়ে আসেন, আমাদের পক্ষে যত বড় সম্ভব একটা চাকরি জোগাড় করে দেব।

আমি বললাম, আগে পড়াশোনা শেষ করুক। পড়াশোনায় খুব ভালো, তাছাড়া তার বাবার খুব আশা ছিল ছেলেমেয়েদের নিয়ে।

সেই ভালো। দরকার হলে আমরা ডিপার্টমেন্ট থেকে তার পড়াশোনার খরচ দেব। আমি জানি আপনার স্বামী আপনাদের জন্যে দশ টাকাও রেখে যায়নি। আপনি চিন্তা করবেন না, পেন্সন, গ্রুপ ইন্সিওরেন্সের টাকা যেন তাড়াতাড়ি পেয়ে যান তার ব্যবস্থা করব। একটা বাড়িও আপনি পেয়ে যাবেন। শহীদ পরিবারদের বাড়ি দেয়া হচ্ছে।

আমাকে তখনই দুই হাজার টাকার একটা চেক দেয়া হলো। আমি বুকে একটা বল পেলাম। যে দেশের জন্য মানুষগুলো প্রাণ দিয়েছে সেই দেশ তার জন্য কিছু একটা করবে তাহলে।

পেন্সনের টাকা-পয়সা তোলার জন্য কাগজপত্র নিয়ে আবার গেলাম। এবারে কাজলের আব্বার পরিচিত একজন এআইজি তার অধঃস্তন অফিসারকে ডেকে আমার সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন।

অফিসার বিনয়ে গলে গিয়ে বললেন, কোনো চিন্তা করবেন না স্যার, সব

ঠিক করে দেব।

তার সাথে অফিসে গিয়েছি, সে কাগজপত্রে চোখ বুলানোর আগেই রাগে ফেটে পড়ল, মুখ খিচিয়ে আমাকে বলল, কি আপনার বেশি ক্ষমতা হয়েছে? ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাবেন? ভাবেন ওপরওয়ালা বললেই কাজ হবে? মনে রাখবেন, টাকা এত সহজে পাওয়া যায় না!

একটা ফাইল হাতে তুলে বললেন, এই দেখেন পাঁচ বছর আগে মারা গেছে, এখনো টাকা-পয়সা পায় নাই! টাকা-পয়সা পাওয়া এত সোজা না। টাকা যদি চান তাহলে এখানে এসে কান্নাকাটি করবেন, খরচপাতি করবেন। ঐ বড় সাহেবদের কাছে গিয়ে কোনো লাভ নেই–

আমি থ হয়ে গেলাম। মানুষটি গুলি খেয়ে মরে গেছে, তার পেন্সনের টাকার জন্য আমাকে এসে কান্নাকাটি করতে হবে? টাকা-পয়সা ঢালতে হবে?

ভদ্রলোক গজগজ করতে করতে সহকর্মীকে বললেন, এই একটা নতুন দল বের হয়েছে, শহীদ পরিবার! যেখানে যাই সেখানেই শহীদ পরিবার! জ্বালিয়ে খাচ্ছে একেবারে!

এইভাবে আমার 'শহীদ পরিবারের' এক নতুন জীবন শুরু হলো।

ঘোরাঘুরি

শহীদ পরিবারের প্রথম কাজ হচ্ছে ঘোরাঘুরি।

আমার ঘোরাঘুরি শুরু হলো। এক অফিস থেকে আরেক অফিস, এক অফিসার থেকে আরেক অফিসার। সাথে থাকে ইকবাল না হয় ছোট ভাই রুহুল। কাজলকে নেয়া যায় না, এসব নোংরা দায়িত্ব থেকে কেমন করে যেন পিছলে বের হয়ে যায়। অফিস-আদালত সম্পর্কে জ্ঞান হয়েছে। বড় বড় অফিসারের আন্তরিক চেষ্টার খুব বেশি মূল্য নেই, যারা ফাইল নাড়াচাড়া করে তাদের ক্ষমতা প্রায় ঈশ্বরের মতো। বারবার যেতে হয়, করুণ মুখে বসে থাকতে হয়, চা নাস্তার জন্য খরচপাতি করতে হয়। আস্তে আস্তে ঘোরাঘুরিতে অভিজ্ঞ হয়ে গেলাম, মাঝে মাঝে বাস রিকশায় একা একা সেক্রেটারিয়েট এজি অফিস চলে যাই।

ঢাকায় থাকার জায়গা নিয়ে খুব সমস্যা। শহীদ পরিবারদের বাসা দেয়া হচ্ছে শুনে তার জন্য ঘুরোঘুরি শুরু করেছি। একদিন খোঁজখবর নিয়ে বাড়ি সংক্রান্ত একজন মন্ত্রী, নাম মতিউর রহমান, তার সাথে দেখা করতে গেলাম। গিয়ে দেখি আমার মতো আরো অনেকেই আছেন। দীর্ঘ সময় পর মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে দেখা হলো, আমাদের দেখে একেবারে ক্ষেপে গেলেন, বললেন, পেয়েছেন কি আপনারা? প্রত্যেকদিন সকালে এসে বসে থাকেন? সকালে ঘুম থেকে উঠেই আর কত বিধবার মুখ দেখব?

আমি লজ্জায় মরে গেলাম, খোদা তুমি আমাকে আর কত অপমান সহ্য করাবে?

খোঁজখবর নিয়ে গেলাম যেখানে শহীদ পরিবারদের বাসার অ্যালটমেন্ট দেয়া হয় সেখানে। জয়েন্ট সেক্রেটারির সাথে অনেক কষ্টে দেখা করতে গিয়েছি ভদ্রলোক আমাকে দেখে চমকে উঠলেন, কাজলের আব্বার এককালীন বিশেষ

বন্ধু মানুষ, কাজী জাহেদুল ইসলাম। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ভাবী, আপনি?

আমাকে এভাবে দেখে বড় একটা আঘাত পেলেন। তিনি কথা বলছেন, এর মাঝে হঠাৎ প্রচণ্ড হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল, সেক্রেটারিয়েট নাকি ঘেরাও হয়েছে। বড় বড় ঢেলা পড়ছে, ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক ধ্বনি!

জাহেদুল ইসলাম সাহেব ব্যস্ত হয়ে বললেন, ভাবী আপনি তাড়াতাড়ি যান। আপনার অ্যাপ্লিকেশন আমার কাছে থাকুক। আমি কিছু একটা ব্যবস্থা করব।

জাহেদুল ইসলাম সাহেব তার কথা রেখেছিলেন, সরকারি নিয়মকানুনের কঠিন বেড়াজাল ভেদ করে আমাকে তিনি সত্যিই একটা বাসা জোগাড় করে দিলেন। জনৈক অবাঙালির পরিত্যক্ত বাসা। বাসার ঠিকানা ১৯/৭ বাবর রোড।

রক্ষীবাহিনী

বাবর রোডের বাসায় ওঠার তিন দিন পর হঠাৎ একদিন রক্ষীবাহিনী এসে হাজির হলো। একজন সুবেদার মেজর এসে জিজ্ঞেস করল, এ বাড়ি আপনি কোথা থেকে পেলেন?

আমি বললাম, সরকার আমাকে দিয়েছে। আমার স্বামী যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তাই।

সুবেদার মেজর কিছু না বলে চলে গেল। আমার মনের ভেতর হঠাৎ করে একটা খটকা লেগে গেল, হঠাৎ করে রক্ষীবাহিনী আসছে কেন?

খানিকক্ষণ পর হঠাৎ করে করে আরেকজন সুবেদার মেজর এসে হাজির। সে একা নয়, তার সাথে এক ট্রাক বোঝাই রক্ষীবাহিনী। সবার হাতে অস্ত্র। সুবেদার মেজরের নাম হাফিজ, ভেতরে ঢুকে বলল, এই বাড়ি আমার। শেখ সাহেব আমাকে দিয়েছেন।

আমি বললাম, সে কী করে হয়? আমার কাছে বাসার অ্যালটমেন্ট রয়েছে—

সে কোনো কথা না বলে টান দিয়ে ঘরের একটা পর্দা ছিঁড়ে ফেলল। সাথে আসা রক্ষীবাহিনীর দলকে বলল, ছেলেমেয়েদের ঘাড় ধরে বের কর।

আমি এতদিনে পোড় খাওয়া পাথর হয়ে গেছি। রুখে দাঁড়িয়ে বলেছি, দেখি তোমার কত বড় সাহস।

সুবেদার মেজর একটু থমকে গিয়ে কিছু না বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে আক্ষরিক অর্থে শত শত রক্ষীবাহিনী দিয়ে পুরো এলাকা বোঝাই হয়ে গেল। বাসা চারদিকে ঘেরাও হয়ে আছে, কাউকে ঢুকতে দেয় না, কাউকে বেরও হতে দেয় না। কাজল মুহসীন হলে ছিল, খোঁজ পেয়ে এসেছে,

তাকেও ঢুকতে দিল না। সারা রাত এভাবে কেটেছে।

ভোর হতেই আমি বের হলাম। পুলিশের কাছে গিয়ে সাহায্য চাইলাম। তারা বলল, আমরা গোল্যমির পোশাক পরে বসে আছি! রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে আমরা কি করব?

বঙ্গভবন, গণভবন এমন কোনো জায়গা আমি বাকি রাখলাম না সাহায্যের জন্যে। কিন্তু লাভ হলো না। আমি তুচ্ছ মানুষ, আমার জন্যে কার মাথাব্যথা?

রাতে ফিরে এসেছি। আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না, অনেক বলে ভেতরে ঢুকেছি। রাত আটটার সময় রক্ষীবাহিনীর দল হঠাৎ করে লাথি মেরে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেল। ইকবাল আমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে, একজন বেয়োনেট উঁচিয়ে লাফিয়ে এল। রাইফেল তুলে ট্রিগারে হাত দিয়েছে, চিৎকার করে কিছু একটা বলছে, গুলি করে মেরে ফেলবে আমাদের?

আমি ছেলেমেয়েদের হাত ধরে বের হয়ে এলাম।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাকে প্রথমবার গৃহহারা করেছিল।

বাংলাদেশ সরকারের রক্ষীবাহিনী আমাকে দ্বিতীয়বার গৃহহারা করল।

আহমদ ছফা

রক্ষীবাহিনীর সাথে এই গোলমালের মাঝে যারা সাহায্যের জন্য ছুটে এসেছে, তার মাঝে ছিল আহমদ ছফা। কাজল তখন মাত্র সত্যিকার লেখালেখি শুরু করেছে, আহমদ ছফা সেই লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়ে এই তরুণ লেখককে নিয়ে প্রকাশকদের কাছে ঘোরাঘুরি করছে। সেই থেকে আমাদের সাথে পরিচয়। প্রায়ই বাসায় আসে, কীভাবে তার ধারণা হয়েছে আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারি। ভালো মন্দ কিছু স্বপ্ন দেখলেই সে চলে আসে বাসায়, আমাকে বলে, কাকীমা, আজ একটা স্বপ্ন দেখেছি।

কি স্বপ্ন বাবা?

ছোট ছোট আধ আঙুলের মানুষ, ঘরের কোনে তেঁতুলের বিচি লাগাচ্ছে। এই স্বপ্নের মানে কি কাকীমা?

দুরূহ স্বপ্ন! কিছু একটা ব্যাখ্যা না দেয়া পর্যন্ত ছফা শান্ত হবে না, তাই আমার কিছু একটা ব্যাখ্যা দিতে হয়।

এই খেয়ালি মানুষটি রক্ষীবাহিনীর আচরণে একেবারে ক্ষেপে গেল। চেনাজানা সমস্ত মানুষকে ডেকে টেনে নিয়ে এল বাবর রোডে। প্রাণ নিয়ে বাসা থেকে বের হবার পর রক্ষীবাহিনীর বীর জওয়ানেরা আমাদের সব জিনিসপত্র রাস্তায় টেনে ফেলে দিয়েছে। তার মাঝে চেয়ার-টেবিলও আছে–রাত্রি বেলা সেখানেই সবাই বসেছে, খোলা আকাশের নিচে এক রাউন্ড চাও খেয়ে ফেলল সবাই। সরকারি যে দলিলটির জন্য আমার এত বড় লজ্জা ছফা যাওয়ার সময় সেটি হাতে করে নিয়ে গেল।

পাশে ডাক্তার মনোয়ারের বাসা, সেখানে রাত কাটালাম আমরা। ডাক্তার সাহেব ইকবালকে নিয়ে টানাটানি করে মাঝরাতে জিনিসপত্র তার বাসায় তুলে ফেললেন।

পরদিন গণকণ্ঠ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় শহীদ পরিবারের নির্যাতনের এই খবরটি ছাপা হলো, সাথে সরকারি অ্যালটমেন্টের কপিটি। আওয়ামী লীগ সরকার তখন প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করছে, তাদের কিংবা রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে কথা বলে সে রকম সাহস কারো নেই, গণকণ্ঠ একমাত্র কাগজ যারা সাহস করে কিছু বলত।

আমি পাশেই একটা ছোট বাসা ভাড়া করে সেখানে উঠে গেলাম।

কয়দিন পর ডাক্তার সাহেব আমার বাসায় এসে হাজির। বললেন, রক্ষীবাহিনীর প্রধান নুরুজ্জামান আপনার সাথে ফোনে কথা বলতে চান।

কেন?

মনে হয় বাসাটা নিয়ে গোলমাল মিটিয়ে ফেলতে চান।

তার আর দরকার নেই। সরকারি বাসার শখ আমার মিটে গেছে। পাকিস্তান আর্মির হাতে যারা মরেনি, এখন রক্ষীবাহিনীর হাতে তারা শেষ হবে?

ডাক্তার সাহেব আমাকে বোঝালেন, আপনার এখন মাথা গরম করলে হবে না। আপনাকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। আপনি যদি বাসাটা পেয়ে যান খুব ভালো হয়, তাহলে ঢাকায় বাচ্চাদের নিয়ে থাকতে, ওদের পড়াশোনা শেষ করতে পারবেন। আমার বাবা যখন মারা যান আমার বয়স তিন। কত ঝামেলা গেছে আমার ওপর দিয়ে, সে তুলনায় আপনার তো কিছুই হয়নি। আমি এখন দাঁড়িয়ে গেছি, আপনিও একদিন দাঁড়িয়ে যাবেন।

ডাক্তার সাহেবের কথা শুনে আমি শেষ পর্যন্ত রক্ষীবাহিনীর প্রধান নুরুজ্জামানের সাথে কথা বলতে রাজি হলাম। ভদ্রলোক বেশ ভালো ভালো কথা বলে বাসার ওপর তালাটি আমাকে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। আমার ওপর যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে তার বিচার করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

বিচারটি খারাপ হলো না, নিচের তালাটি দেয়া হলো সুবেদার মেজর হাফিজকে।

কাজল ঝামেলা মোটে সহ্য করতে পারে না, এসব যন্ত্রণা দেখে মুহসীন হলে পাকাপাকিভাবে আশ্রয় নিল। প্রতিদিন সকালে উঠে কাগজে খুঁজে দেখে শহীদ পরিবারকে রক্ষীবাহিনী উচ্ছেদ করেছে এ রকম খবর আছে কি না! যদি না থাকে মাঝে মাঝে দেখা করতে আসে।

ফার্নিচার

কাজল তখন বিয়ে নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে। সে একদিন বাসাটা পর্যবেক্ষণ করে বলল, কিছু ফার্নিচার কেনা দরকার।

কথাটা সত্যি বাসায় ফার্নিচার বলতে কিছু নেই। কয়েকটা তক্তপোশ, কড়ই কাঠের কয়েকটা চেয়ার-টেবিল, একটি সোফার কিছু ভগ্নাংশ—এই হচ্ছে সম্বল। রাতে মেঝেতে বিছানা পাতা হয়। মশারিতে মাপমতো দড়ি লাগানো আছে, ঘুমানোর সময় মনি চোখের পলকে সবগুলো মশারি লাগিয়ে ফেলে। কিছু ফার্নিচারের সত্যিই দরকার। কাজল একদিন হাতে কিছু টাকা নিয়ে ফার্নিচার কিনতে বের হলো। সাথে গেল ইকবাল।

ফার্নিচার না কিনে এই দুই ভাই কিনে আনল একটা করাত, একটা র‍্যাঁদ, একটা বাটাল, একটা হাতুড়ি এবং কিছু তক্তা। দেখে তো আমি আকাশ থেকে পড়লাম, এ কি?

কাজল বলল, ফার্নিচারের যে দাম, ছোঁয়া যায় না! এর থেকে এই ভালো নিজেরাই তৈরি করে নেব।

নিজেরা তৈরি করে নেবে?

ইকবাল বলল, এত অবাক হবার কী আছে? ভাবছেন তৈরি করতে পারব না?

কী ভাবছি সেটা আর পরিষ্কার করে বললাম না।

খাওয়ার পর সবাই গোল হয়ে বসেছে। কাজল জিজ্ঞেস করল, কী কী তৈরি করা যায়?

আমি চুপ করে রইলাম, কিন্তু অন্য ভাইবোনের দেখা গেল বেশ উৎসাহ। একজন বলল একটা শোকেসের কথা, আরেকজন বলল সোফা সেটের টেবিল, আরেকজন বলল একটা ড্রেসিং টেবিলের কথা। ইকবাল বলল, সহজ জিনিস

দিয়ে শুরু করা যাক, প্রথমে তৈরি হোক একটা সেলফ।

সবাই রাজি হলো।

ছাদে ইলেকট্রিক তার লাগিয়ে একশ ওয়াটের আলো লাগানো হলো। কাগজে নকশা করে ডিজাইন করা হলো। এবং তারপর মহা সমারোহে কাঠের তক্তা কাটা শুরু হলো। দ্বিতীয় তক্তাটি কাটার সময় কাজল ঘামতে ঘামতে নিচে নেমে এল, সে আর এর পর উপরে যায়নি।

ইকবাল সেটার পেছনে লেগে রইল, সাথে তার দুই সমবয়সী মামা, নুরুন্নবী শেখ আর মাহবুব শেখ। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসি। র‍্যাদ ঘষতে একেকজন ঘেমে চুপসে যাচ্ছে। অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করে সবাই ক্লান্ত হয়ে সে রাতে ঘুমুতে গেল।

পরদিন আবার কাজ শুরু হয়েছে, দেখা গেল মোটামুটি সমতল কাঠ একরাতেই ঢেউয়ের মতন বেঁকে গেছে! কাঠ সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই বলে ছুতার মিস্ত্রি তাদের ভেজা কাঠ গছিয়ে দিয়েছে এবং যতই শুকাচ্ছে সেই কাঠ ততই বেঁকে যাচ্ছে! এই কাঠ দিয়ে দ্রুত কোনো একটা কিছু দাঁড়া না করালে আর কোনোদিন পেরেক ঠুকে কোথাও বসানো যাবে বলে মনে হয় না। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে সারা দিন কাজ চলল এবং অবাক হয়ে দেখলাম সন্ধ্যের ভেতর সত্যি সত্যি একটা সেলফ দাঁড়া হয়ে গেছে। বার্নিশ করা হবে না রং দেয়া হবে সেটা নিয়ে বিতর্ক করে শেষ পর্যন্ত সেটাতে কাল রং দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। রং দিয়ে সেই রং শুকানোর আগেই বসার ঘরে সেই শেলফ নিয়ে আসা হলো। অবিশ্বাস্য ব্যাপার, সত্যি সত্যি জিনিসটা দেখতে চমৎকার হয়েছে। শেলফের মতোই, কিন্তু তাতে নানা আকারের খোপ, সেখানে একটা দুইটা পুতুল সাজিয়ে রাখার পর ঘরের চেহারা পাল্টে গেল।

কাজল বলল, কী বলছিলেন না আমরা পারব না? এখন?

আমি আর কি বলি?

সেই করাত, র‍্যাদ এবং বাটাল এখনো আছে। সেটা আর দ্বিতীয়বার কখনো ব্যবহার করা হয়নি!

প্রতিবেশী

বাবর রোডে আমাদের পাশের বাসায় থাকেন ডাক্তার মনোয়ার হোসেন, তার স্ত্রী মিসেস মনোয়ার হচ্ছেন অত্যন্ত হাসি খুশি মানুষ। সব জায়গায় তার মতো একজন মানুষ থাকে যারা সবসময় সবার দায়িত্ব ঘাড় পেতে নিয়ে নেয়। এটাকেই সম্ভবত বলে নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো, তবে তার বেলা সেটা শুধু বনের মোষ নয়, সেটা হচ্ছে বনের হাতির পাল তাড়ানো। জগৎসংসারের সবকিছুতে তার উৎসাহ। ঠিক কী কারণে জানি না আমাদের জন্য তার বিশেষ ভালোবাসা ছিল। তার বাবা মা এবং এক বোনের স্বামী মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে মারা গেছেন, সম্ভবত গোড়াতে সে কারণেই আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে ধীরে ধীরে আমাদের নিজেদের মানুষের মতো হয়ে গিয়েছিলেন।

তার সবচেয়ে প্রিয় ব্যাপার ছিল বিয়ের অনুষ্ঠান! সবসময় তক্কে তক্কে থাকতেন কী ভাবে একটা বিয়ের অনুষ্ঠানের মাঝে জড়িয়ে পড়বেন। প্রথম যখন তার প্রতিবেশী হিসেবে এসেছি তার এই গুণের কথা জানি না। কাজলের বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। ভক্ত পাঠিকার সাথে বিয়ে কাজেই গোড়াতে আমাদের বিশেষ কিছু করার নেই। প্রথমে কথা ছিল বিয়ের এনগেজমেন্ট হবে, সেভাবে আয়োজন করা হয়েছে। মিসেস মনোয়ার নীল একটা কাতান শাড়ি কিনে এনেছেন, ব্লাউজপিস কেটে ব্লাউজও তৈরি করা হয়ে গেছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে কীভাবে কীভাবে জানি ঠিক করা হলো যে এনগেজমেন্ট নয়, একেবারে বিয়ে পড়িয়ে বউ তুলে আনা হবে। আমি চোখে আঁধার দেখছি। তার মাঝে মিসেস মনোয়ার এসে হাজির। বিয়ের কথা শুনে তার খুশি দেখে কে! নীল শাড়ি পরে তো বিয়ে হয় না, লাল একটা শাড়ি কিনতে হয়! যত কমই হোক একটু আধটু গয়না তৈরি করতে হয়, বরযাত্রী নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করতে হয়।

মিসেস মনোয়ার সব দায়িত্ব নিয়ে নিলেন। শিখুকে নিয়ে গয়নার দোকানে গিয়েছেন, গয়না কেনার পর দেখলেন হাতে রিকশা ভাড়া পর্যন্ত নেই! দোকানে আবার ফিরে গিয়ে তিনি রিকশা ভাড়া আদায় করে নিলেন!

লাল কাতান কেনার পর ব্লাউজ তৈরি করতে হয়, এত কম সময়ে ব্লাউজ কে তৈরি করবে? মিসেস মনোয়ার এক দর্জির খোঁজ আনলেন যে ডাক্তার মনোয়ারের প্রাক্তন রোগী। রাতে ঘুম থেকে তুলে তাকে দিয়ে ব্লাউজ বানানো হলো। বরযাত্রী যাওয়ার সময় সাথে কয়টা গাড়ি থাকলে ভালো দেখায়, সেটা নিয়েও সমস্যা নেই, গাড়ি আছে সে রকম মানুষ খুঁজে খুঁজে তিনি দাওয়াত দিয়ে দিলেন!

অবিশ্বাস্য দক্ষতায় কাজলের বিয়ে হয়ে গেল!

মিসেস মনোয়ারের বিয়েপ্রীতি অত্যন্ত প্রবল। নতুন বর কনে কিংবা হবু বর-কনের মাঝে তিনি আশ্চর্য নানা রকম গুণ খুঁজে পেতেন। একজন বর ছিল তালপাতার সেপাই, লম্বা ঢ্যাংগা, মনে হয় বাতাসে উড়ে যাবে, দেখে বললেন, 'আহা, কী সুন্দর! কী লম্বা জামাই!'

আরেকজন ছিল বাটকুল, দেখে বললেন, কী সুন্দর ছোটখাটো জামাই!

একবার একজনের বিয়ের প্রস্তাব এসেছে যার মুখটা একটু বাঁকা, দেখে বললেন, ওটা কিছু না। ফোরসেপ ডেলিভারিতে ওরকম একটু হয়েই থাকে! জামাইয়ের মনটা খুব ভালো, মানুষের মন হচ্ছে বড় কথা।

প্রাণপণ চেষ্টা করে যেতেন একটি বিয়ে শুরু করে দিতে। যখন সত্যি বিয়ে শুরু হয়ে যেত তার খুশি দেখে কে! বিয়ের ঝামেলা থেকে বড় ঝামেলা কী হতে পারে, তার সব ঝামেলা তিনি হাসিমুখে নিয়ে নিতেন।

খুব অল্প বয়সে মারা গেছেন মিসেস মনোয়ার। একজনের বিয়ের গায়ে হলুদের আয়োজন করেছেন বাসায়, প্রচণ্ড ব্লাড প্রেসার নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে করতে হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে গেল।

হাসপাতালে ছিলেন বেশ কিছুদিন। আমি দেখতে যেতাম। বিশ্বাস হতো না এ রকম একজন প্রাণবন্ত মানুষ এভাবে শয্যাশায়ী থাকতে পারেন।

দুই-তিন মাস শয্যাশায়ী থেকে তিনি মারা গেলেন।

মানুষের আনন্দের জন্য সারাটি জীবন ছুটে বেরিয়েছেন। মানুষকে তিনি যত আনন্দ দিয়েছেন খোদা যদি তাকে তার এক ভগ্নাংশও ফিরিয়ে দেন, অনন্ত কালেও সেটা ফুরাবার কথা নয়!

চোর

দেশের অবস্থা তখন খুব খারাপ হয়েছে। চোরের উপদ্রবও বেড়েছে। একদিন শেফুর গলা থেকে চোর একটা হার ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল। লাফিয়ে উঠে দেখতে পেলাম চোর রেলিং দিয়ে ধীরে সুস্থে হেঁটে যাচ্ছে। শিখু চিৎকার করে বলল, চোর চোর চোর–

কাজল দিল একটা ধমক, চ্যাঁচাচ্ছিস কেন? চোরকে খেপিয়ে দিচ্ছিস পরে রাস্তায় বের হতে হবে না?

দেখা গেল চোর মোটে ক্ষেপেনি। কারণ পরে আরেক দিন সে এসে হাজির হলো। এবারে আরেকটু সময় নিয়ে এসেছে। কারণ ভোরবেলা যখন সবাই ঘুম থেকে উঠেছি, তখন ঘর মোটামুটি খালি। শেফুর বিয়ের শাড়ি ছাড়া আর সব গেছে। বাসায় ছেলেদের পরে বের হবার মতো শার্টও নেই।

পাশের বাসার মিসেস মনোয়ার বললেন, দৌড়ে যাও নিউমার্কেটের সামনে– চোরাই মাল বিক্রি হয়, তোমাদের জামা কাপড়গুলো পেতে পার, সস্তায় আবার কিনে নিতে পারবে।

সেই চেষ্টা আর হলো না। কাজল কোনোরকমে বাইরে গিয়ে দুটি শার্ট কিনে আনল, একটা তার জন্য একটা ইকবালের জন্য। সেই শার্ট পরে তারা গেল ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করতে। নতুন শাড়ি কেনার আগে শেফু আর কী করবে, তার বিয়ের শাড়ি পরেই ঘুরে বেড়াল কয়দিন!

দেখা গেল চোর যাবার আগে তাড়াহুড়োয় তার স্যান্ডেল জোড়া ফেলে গেছে। চোর স্যান্ডেল পরে চুরি করতে আসে সেটাও আমরা জানতাম না। স্যান্ডেলগুলো খারাপ না, চোরকে পাওয়া গেল না তো কী হয়েছে, তার স্যান্ডেলকে তো পেয়েছি!

পরিশিষ্ট

দীর্ঘদিন পরের কথা।

স্বাধীনতা সংগ্রামের পর বেঁচে থাকার জন্য আমি আমার নিজের সংগ্রাম শুরু করেছিলাম। আমার সেই সংগ্রাম শেষ হয়েছে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, মানুষ হয়েছে। তাদের নিজেদের ছেলেমেয়ে, সংসার হয়েছে। সবাইকে নিয়ে পৃথিবীর এক মাথা থেকে আরেক মাথাজুড়ে আজ আমার কত বড় সংসার! একা শুরু করেছিলাম, এখন আর একা নই, পাশে কতজন এসে দাঁড়িয়েছে।

মেজো ছেলের কাছে আমেরিকা বেড়াতে যাব। তার যোগাড়যন্ত্র চলছে। টিকিট এসেছে, পাসপোর্ট নিয়ে ভিসা তুলতে হবে, ডলার কিনতে হবে এ রকম নানা রকম হাঙ্গামা। বাসাতে যখনই কোনো বিশেষ উৎসব হয় সবাই মিলে 'সুনিলিত সাগরিত' নাম দিয়ে সাময়িকী বের করে ফেলে। সেখানে সবাই মিলে লেখে, ছবি আঁকে, কার্টুন ব্যঙ্গ চিত্র দেয়া হয়, গুরু গম্ভীরভাবে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। সবারই লেখার হাত রয়েছে, সবাই মোটামুটি ছবি আঁকতে পারে, তা ছাড়া সবার ভেতরেই একটা সূক্ষ্ম রসিকতা বোধ রয়েছে, সব মিলিয়ে চমৎকার একটা সুখপাঠ্য জিনিস বের হয়ে যায়। একান্ত ব্যক্তিগত সেসব জিনিস দীর্ঘদিন পর দেখতে বেশ লাগে! আমি আমেরিকা যাচ্ছি সেটা বিয়ে কিংবা সন্তানের জন্মের মতোই মস্ত বড় একটা ব্যাপার, তাই খুব হৈ চৈ করে সুনিলিত সাগরিত বের করা হলো, উপরে লেখা :

'সুনিলিত সাগরিত (একটি পারিবারিক পত্রিকা), বিশেষ বিদেশ যাত্রা সংখ্যা, ২১ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা'

ভেতরে সবার লেখা, ছবি, কার্টুন!

এর মাঝে একদিন কাজল ময়মনসিংহ গিয়েছে বউমাকে নিয়ে, নাতনিদের আমাদের কাছে রেখে গেছে। তারা দেখি শুধু ছোটাছুটি করছে, হাতে একটি কাগজ, আমাকে সেটা দেখানো হবে না! আমার কৌতূহল হলো কিন্তু ব্যাপারটি গোপনীয় আমাকে বলা হলো না!

বিশ তারিখে ফ্লাইট, আঠারো তারিখ আমি কাজলের বাসায় গেছি। আমেরিকা যাওয়া উপলক্ষে সবাই মিলে চাইনিজ খাওয়া হবে। মানুষের চাঁদে যাওয়া নিয়ে যত উত্তেজনা হয়েছিল, আমার আমেরিকা যাওয়া নিয়ে প্রায় সমান উত্তেজনা! যত জায়গায় যত আত্মীয়স্বজন ছিল সবাই চলে এসেছে। চাইনিজ রেস্টুরেন্টে জায়গা হলো না এমন অবস্থা! ছোট বাচ্চাদের ভেতরে চাপা উত্তেজনা, খাওয়া ছাড়াও আরো কিছু ব্যাপার আছে!

ব্যাপারটা কী বোঝা গেল একটু পরেই, প্যাকেটের ভেতর থেকে একটা বড় পদক বের হলো, সোনালি আর সবুজ রঙের সেই পদকে বড় বড় করে লেখা

আয়েশা ফয়েজ
সার্থক মা পদক

ছেলেমেয়ে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই মিলে আমার জন্য এই পদকটা তৈরি করেছে। ভয়াবহ বিপর্যয়ের মাঝে শক্ত হাতে হাল ধরে ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্যে আমার নাকি এই পুরস্কার! একজন মাকে কখন সার্থক বলা যায় কিংবা সার্থক হলেই তাকে সবুজ এবং সোনালি রঙের বড় একটা পদক দেয়া যায় কি না সেটা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমি পদকটা বড়দের করতালি এবং ছোটদের চিৎকারের মাঝে নিয়ে নিলাম।

পুরো ব্যাপারটাই একটা হালকা হাসি খুশির ব্যাপার কিন্তু আমার চোখ আর্দ্র হয়ে উঠল। আমি কি সত্যিই আমার দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি? এই আনন্দোল্লাসের মাঝে সেই মানুষটি যদি হঠাৎ এসে হাজির হতো তাহলে না জানি তার কেমন লাগত। কী করত লোকটি? নিশ্চয়ই অবাক হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করত, আয়েশা, এরা কারা?

আমি বলতাম, চিনতে পারছ না? এ যে তোমার ছেলে কাজল, দেখ হুমায়ূন আহমেদ নামে সে কত বড় সাহিত্যিক হয়েছে! তার পাশে যে মেয়েটি সে হচ্ছে তোমার পুত্রবধূ টিংকু। আর ঐ দেখ তোমার

ফুটফুটে নাতনিরা, নোভা, শীলা আর বিপাশা। ঐ দেখ তোমার অন্য ছেলেমেয়েরা, শেফু, শিখু, শাহীন আর মনি। আলী হায়দার খান নামে সেই ছেলেটির কথা মনে আছে? যুদ্ধের সময় আমাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য যে কত চেষ্টা করেছিল সে হচ্ছে শেফুর বর। আর ঐ দেখ তাদের ফুলের মতো মেয়েরা, শর্মি, অমি আর নীষা! ঐ যে শিখু, তার বরকে তুমি দেখনি। তার নাম হচ্ছে শহীদ উল্লাহ, যখন ছেলেরা আমেরিকা পড়তে গিয়েছিল সে নিজের ছেলের মতো আমার পাশে ছিল সর্বক্ষণ। ঐ যে তাদের ছটফটে মেয়ে শুচি। তোমার ছোট্ট ছেলে শাহীনকে দেখ কত বড় হয়েছে, পাশে যে বাচ্চামতো মেয়েটি সে হচ্ছে তার স্ত্রী রীতা! মনে আছে কথা জানত না বলে মনিকে নিয়ে তোমার কত দুশ্চিন্তা ছিল? ঐ দেখ তার বিয়ে হয়েছে স্বপনের সাথে। ইকবাল এখানে নেই, আমি যাচ্ছি তার সাথে দেখা করতে আমেরিকায়, সেখানে আছে তার স্ত্রী ইয়াসমীন, আর ছেলেমেয়ে, [illegible] আর ইয়েশিম।

লোকটা অবাক হয়ে বলত, কী আশ্চর্য, আমি ছিলাম না কয়দিন তার মাঝে এত কিছু হয়ে গেছে?

আমি বলতাম, কয়দিন কী বলছ, তুমি জান কুড়ি বছর হয়ে গেছে?

কুড়ি বছর? কী আশ্চর্য!

কিন্তু সেই লোকটি তো আর সত্যিই আসতে পারে না!

কেমন করে আসবে? সেই কতকাল আগে কিছু নিষ্ঠুর মানুষ কি অনায়াসে আমার কাছ থেকে তাকে কেড়ে নিয়েছে।

আমি সাবধানে চোখ মুছে আনন্দ উল্লাসে যোগ দিলাম।